মন্দ্রসপ্তক

হুমায়ূন আহমেদ

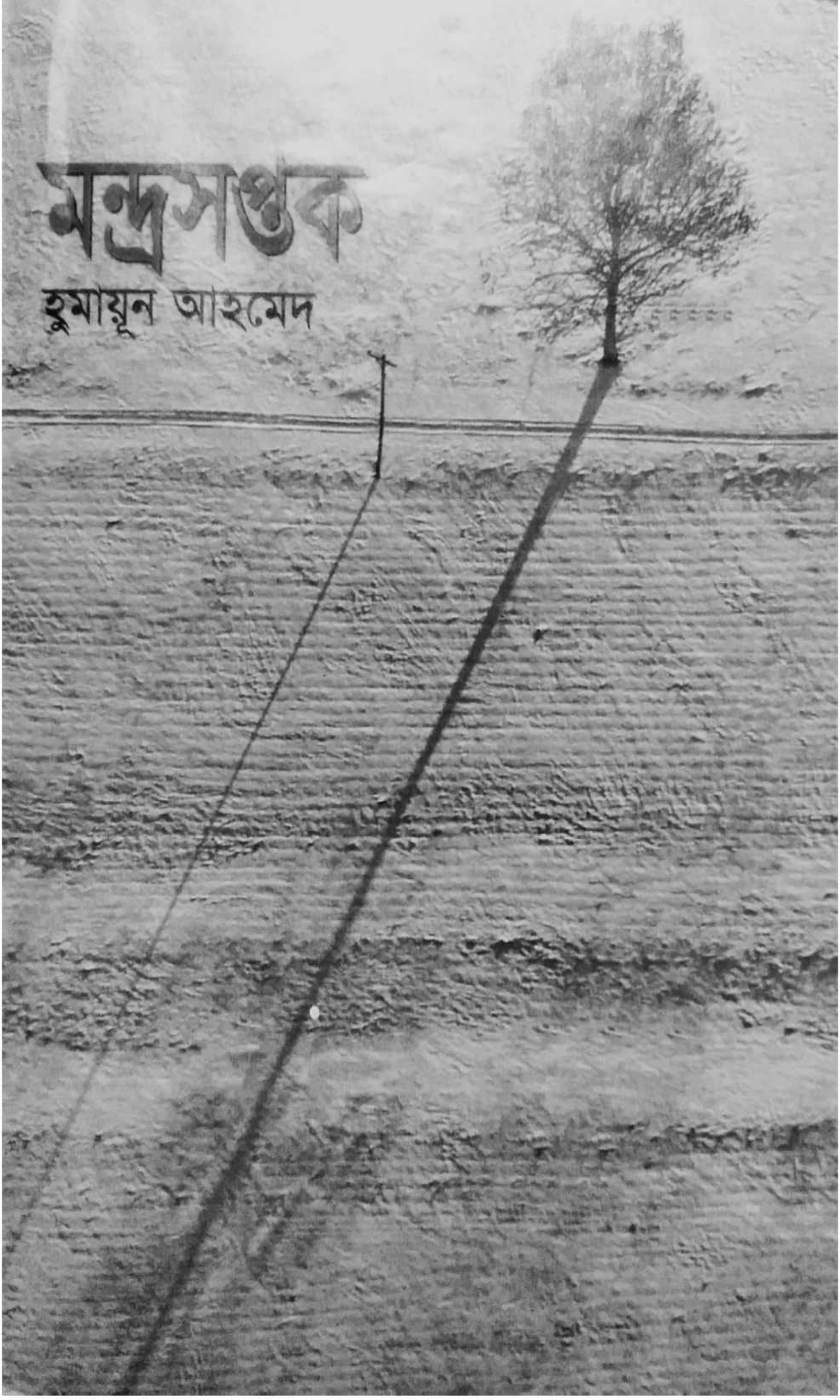

মন্দ্রসপ্তক

হুমায়ূন আহমেদ

সময় প্রকাশন

সকালবেলাতেই মৃত্যু সংবাদ।

টুথব্রাসে পেস্ট মাখাচ্ছি। অস্বস্তি নিয়েই মাখাচ্ছি — কারণ কার ব্রাস ঠিক ধরতে পারছি না। এ বাড়িতে তিনটা সাদা রঙের টুথব্রাস আছে যার একটা আমার। সেই একটা মানে কোন্‌টা আমি কখনো ধরতে পারি না। বাকি দু'টার মালিক আমার দু'বোন। এদের চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ — এরা দূর থেকে বলতে পারে ব্রাসটা কার। এই কারণে দাঁত মাজার পর্বটা আমি সাধারণত অতি দ্রুত সেরে ফেলি। বোনদের চোখে পড়ার আগেই। এরা বড় যন্ত্রণা করে।

আজ আমার পরিকল্পনা ছিল ধীরে সুস্থে সব কাজকর্ম করা। দাঁত মাজার পর্বে মিনিট দশেক সময় দেবার কথা ভাবছিলাম। সম্ভব হল না। মীরা এসে বলল, দাদা শুনেছিস, মেজো খালু সাহেব মারা গেছেন।

আমি অসম্ভব অবাক এবং দুঃখিত হবার ভাব করলাম। যেন পৃথিবীর সবচে' ভয়াবহ খবর এইমাত্র শুনলাম। দুঃখের ভাবটাকে আরো জোরালো করার জন্যে কিছু-একটা বলা দরকার। যেমন করুণ গলায় বলা, হোয়াট এ ট্রাজেডি' কিংবা 'কি সর্বনাশ'! এই দু'টার মধ্যে কোনটা বলব ভাবছি, তখন মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুই আবার আমার ব্রাস দিয়ে দাঁত ঘসছিস? আবার? যেন এটাই বর্তমান সময়ের গ্রেট ট্রাজেডি। মেজো খালু সাহেবের মৃত্যু চাপা পড়ে গেল। আমি উদাসিন ভঙ্গিতে বললাম,

'এটা তোর নাকি?

'ব্রাসের গায়ে এম লেখা দেখছিস না? গতকালও আমার ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলি। এইসব কি?

'গতকাল তোর ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলাম? তুই বুঝলি কি করে?'

'সিগারেটের গন্ধ থেকে বুঝেছি। ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বের হয়।'

মীরার দিকে তাকিয়ে মনে হল সে কেঁদে ফেলার একটা চেষ্টা করছে। আমার দুই বোন কাঁদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। অতি তুচ্ছ কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে এরা কাঁদতে পারে। গত শুক্রবারে টিভি-র একটা নাটক দেখে এরা দু'জনই এমন মায়াকান্না জুড়ে দিল যে বড় চাচা ধমক দিয়ে বললেন — এসব হচ্ছে কি? এই, টিভি বন্ধ করে দে তো। এদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা! আসলেই বড় যন্ত্রণা। একই চিরুণী দিয়ে সেও মাথা আঁচড়াচ্ছে, আমিও আঁচড়াচ্ছি, তাতে দোষ হচ্ছে না। ব্রাসের বেলায় একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে।

আমি বললাম, কাঁদছিস কেন? কেঁদে ফেলার মত কি হল?

মীরা জবাব না দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। মীরা বয়সে আমার তিন বছরের ছোট। ওর এখন একুশ চলছে। যদিও চেহারায় খুকী-খুকী ভাবটা রয়ে গেছে। শুধু চেহারায় না, স্বভাবেও। একদিন বাসায় এসেছে কাঁদতে কাঁদতে, কারণ এক রিক্‌শাওয়ালা নাকি তাকে গালি দিয়েছে। বলেছে — এই ছেমরি। একজন রিক্‌শাওয়ালা কি করে মীরার মত অত্যন্ত রূপবতী মেয়েকে এই ছেমরি বলতে পারে সে এক রহস্য। রূপবতীদের গালি দেয়া বেশ কঠিন। তাছাড়া মীরা শুধু রূপবতীই নয়, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে তার ব্যবহারও খুব ভাল। কাজের লোক, রিক্‌শাওয়ালা এদের সবাইকে সে আপনি করে বলে। তাকে কেন রিক্‌শাওয়ালা গালি দেবে? মীরা অবশ্যি কিছুই বলল না। সারা বিকাল ফুঁপাল।

নাসতার টেবিলে মা বললেন, তোর মেজো খালু মারা গেছেন, শুনেছিস? আমি নিস্পৃহ গলায় বললাম, হুঁ।

দুঃখিত, ব্যথিত হবার ভঙ্গি মা'র সামনে করলাম না। এক বিষয় নিয়ে দু'বার অভিনয় করার কোন মানে হয় না।

মা বললেন রাত তিনটার সময় মারা গেলেন। ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে বললেন, ফরিদা, এক গ্লাস পানি দাও। ফরিদা পানি এনে দিল। পানি খেয়ে বললেন, মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ফরিদা বলল, মেয়েকে ডাকার দরকার কি? তোর মেজো খালু বললেন — শরীরটা ভাল লাগছে না। তখন তাঁর খুব ঘাম হতে লাগল। তারপর . . .

মা নিপুণ ভঙ্গিতে মৃত্যু-সময়কার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বলতে লাগলেন। এতসব খুঁটিনাটি তিনি কোত্থেকে জোগাড় করলেন কে জানে! আমি লক্ষ্য করেছি, মৃত্যু-বিষয়ক খুঁটিনাটি মেয়েরা খুব আগ্রহ করে বলে।

'তোর খালুর ঘাম দেখে ফরিদা বলল, এত ঘামছ কেন? গরম লাগছে? তোর খালু বললেন, একটা ভেজা তোয়ালে দাও . . .'

আমি মা'কে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এত খবর পেলে কোথায়?

মা'র চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। তাঁকে কোন প্রশ্ন করলেই তিনি মনে করেন তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তখন অসম্ভব রেগে যান। এই ভোরবেলাতেই মা'কে রাগিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। আমি আগের প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে বললাম, বেচারা অল্প বয়সে মারা গেল। তুমি যাচ্ছ ও বাড়িতে?

মা আৎকে উঠে বললেন, সংসার ফেলে আমি যাব কি করে? তোর ছোটচাচীর আবার ব্যথা উঠেছে।

'তাই নাকি?'

'সারারাতই তো ব্যথায় ছটফট করল। খবর রাখিস না — নাকি? হাসপাতালে নিতে হবে মনে হয়। তোর ছোটচাচা বলছিল দুপুর নাগাদ ব্যথা না কমলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।'

'আমি শুকনা গলায় বললাম — ও'

ছোট চাচীর ব্যথা হচ্ছে নিত্যদিনকার একটা ব্যাপার। এই খবরে শুকনো 'ও' ছাড়া কিছু বলা যায় না। ছোটচাচীর ব্যথা এবং ব্যথার সঙ্গে জড়িত কুঁ কুঁ কাতরধ্বনির সঙ্গে আমরা এত পরিচিত যে, এখন এসব শুনলে মুখের ভাবভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ছোটচাচীর 'ব্যথা' আমাদের নানান সময়ে নানান উপকার করে। এই যেমন আজ করছে। মা বলতে পারছেন — ছোটচাচীর ব্যথার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। যে সমস্ত বিয়ের দাওয়াতে আমাদের যেতে ইচ্ছে করে না আমরা খবর পাঠাই — ছোটচাচীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। কি যে অবস্থা!

সংসারে একজন সিরিয়াস ধরনের রোগি থাকার অনেক সুবিধা। খুব কাজে লাগে।

অবশ্যি ছোটচাচীর ব্যথার সমস্যা না থাকলেও যে মা মেজো খালার বাসায় যেতেন তা মনে হয় না। ফরিদা খালা মা'র আপন বোন না। খালাতো বোন। যাকে মা খুবই অপছন্দ করেন। শুধু মা একা না, এই মহিলাকে কেউ দেখতে পারে না। সুন্দরী একজন মহিলা, যে খুব চমৎকার করে কথা বলে, তাকে কেন সবাই এত অপছন্দ করে কে জানে? আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই মনে হয়। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা ভাল। বেশ আদুরে ভঙ্গি আছে। বাসায় গেলে প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন। তবু কেউ তাঁকে দেখতে পারে না।

আসলে অপছন্দ করা উচিত মেজো খালুকে। ভদ্রলোক দেখতে কোলা ব্যাঙের মত। মুখের হা-টা অনেক বড় বলে যখনই হাসেন তখনই আলজিভ দেখা যায়। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ভুড়ি লাফালাফি করে। কুৎসিত দৃশ্য। স্বভাবটাও কুৎসিত। অসম্ভব কৃপণ। আটচল্লিশ বছর বয়সেই বাড়ি গাড়ি করে হুলস্থূল করেছেন অথচ হাত দিয়ে একটা পয়সা বের হয় না। আমার বড় বোন ইরার বিয়েতে এসেছিলেন খালি হাতে। অবশ্যি এসেই বললেন — জামাইয়ের জন্যে একটা স্যুটের কাপড় কিনে রেখেছি। জামাইকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, দরজির কাছে মাপ দিয়ে আসবে। শুধু শুধু স্যুটের কাপড় দেয়ার কোন অর্থ হয় না। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, কাপড়ের চেয়ে দরজির খরচ বেশি।

ইরার স্বামী-বেচারা এখনো সেই স্যুট পরতে পারেনি। নতুন জামাই তো আর ঐ বাড়িতে গিয়ে বলতে পারে না — খালুজান, স্যুটের মাপ দিতে এসেছি।

আমার ধারণা, মেজো খালু স্যুটের কাপড়ের কথা বলে প্রচুর বিয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়তো আরো খেতেন।

না। একজন মৃত মানুষ সম্বন্ধে এইসব ভাবা উচিত না। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই অনেক ভাল গুণ ছিল, আমরা যার খবর রাখি না। একজন মৃত মানুষ সম্পর্কে ভাল ভাল কথা ভাবা দরকার। চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে অনেক চেষ্টা করলাম ভদ্রলোক সম্পর্কে ভাল কিছু মনে করতে। মনে পড়ল না।

চা শেষ করে উঠতে যাব, মা বললেন — সময় করে একবার ও বাড়িতে যাস তো। কেউ না গেলে খারাপ দেখায়।

আমি বললাম, আচ্ছা। আমাদের বাড়ির সিনিয়ার মানুষদের কোন কথাতেই আমি 'না' বলি না। এতে সবার ধারণা হয়েছে যে, আমি একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্রছেলে, তবে কিঞ্চিৎ বোকা। বোকা না হলে কেউ কি আর সব কথাতেই হ্যাঁ বলে? অবশ্যি এমনিতেও আমি আমার বুদ্ধিমত্তার তেমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারি না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বি. এ. পাস করে বর্তমানে নাইট সেকশনে 'ল' পড়ছি। কেন পড়ছি নিজেও জানি না! 'ল' পাশ করে কোর্টে গিয়ে ফাটাফাটি করব এই জাতীয় দিবাস্বপ্ন আমার নেই। পড়তে হয় বলে পড়া। শুনেছি 'ল'তে ভর্তি হয়ে থাকলে দু'-তিন বছর পর আপনা-আপনি ডিগ্রী হয়ে যায়। সেই ভরসাতেই আছি। বাড়ির অন্যদেরও আমার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নেই। আমার সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব হচ্ছে — করুক যা ইচ্ছা, কোন ঝামেলা তো করছে না। বেচারা আছে নিজের মত।

আমাদের বাড়ির লোকজনদের কিছু পরিচয় দেয়া মনে হয় দরকার। এ বাড়ির সবচে' সিনিয়র এবং সবচে' নির্বোধ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার বড় চাচা। বয়স তেষট্টি। দৈত্যের মত শরীর। যাকে বলে বৃষ-স্কন্ধ। এখনো নিয়ম ধরে একসারসাইজ করেন। ভোরবেলা ছোলা এবং মধু খান। রাতে ঘুমুবার আগে যোগব্যায়াম করেন। তাঁর তিন মেয়ে। তিনজন থাকে আমেরিকায়। বিয়ে করে বাড়ি-টারি বানিয়ে সুখে আছে বলা যেতে পারে। বড় চাচী গ্রীনকার্ড নাকি কি যেন পেয়েছেন। বছরের বেশির ভাগ সময় মেয়েদের সঙ্গে থাকেন। মাঝে মাঝে দেশে আসেন।

বড় চাচা ফিলসফিতে এম.এ.। অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। ফিলসফি বিষয়টাতেই সম্ভবত কোন গণ্ডগোল আছে। এই বিষয় নিয়ে বেশিদিন পড়াশোনা করলেই লোকজন খানিকটা নির্বোধ হয়ে যায় বলে আমার ধারণা। বড় চাচা যেমন হয়েছেন। তবে নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। ভাল খাওয়া-দাওয়া তাঁর খুবই পছন্দ। যদিও গত দু'মাস ধরে নিরামিষ খাচ্ছেন। কোথায় নাকি পড়েছেন নিরামিষ খেলে শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। এখন সেই চেষ্টাই করছেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, শরীরে ইলেকট্রিসিটি হলে লাভ কি? বড় চাচা তার উত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যার অর্থ — 'এই গাধা বলে কি!'

শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানেও তিনি বেশ কিছু সময় ব্যয় করেন।

তিন ভাইয়ের দু'নম্বর হচ্ছেন আমার বাবা। রোগা-পটকা বেঁটে একজন মানুষ। অসুখ-বিসুখ তাঁর লেগেই আছে। সম্প্রতি রাতে চোখে কম দেখছেন। বড় চাচার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট। যদিও তাঁকে বড় চাচার চেয়ে অনেক বয়স্ক মনে হয়। ব্যাংকে মাঝারি ধরনের একজন অফিসার। কথাবার্তা একবারেই বলেন না। বাড়িতে যে সময়টা থাকেন তার সবটাই কাটান খবরের কাগজ পড়ে। বাড়িতে দুটো খবরের কাগজ রাখা হয়। আমার ধারণা, এই দুটো খবরের কাগজের প্রতিটি ছাপা শব্দ তিনি তিন-চারবার করে পড়েন। আমার বাবা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি আমি একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি। পরে তা বলা যাবে।

এ বাড়ির সবচে' সুপুরুষ, সবচে' স্মার্ট এবং সবচে' সাকসেসফুল মানুষ হচ্ছেন আমার ছোটচাচা। চোখের ডাক্তার। ভিয়েনা থেকে আই সার্জারিতে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। এসেই দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছেন। 'চোখ উঠা' রোগ ছাড়াও যে বাংলাদেশে চোখের এত রোগ আছে আমার জানা ছিল না। আমাদের এই তিনতলা বাড়ির পুরোটাই ছোটচাচার টাকায় করা। একতলায় তিনটা ঘর নিয়ে তাঁর চেম্বার। রোগি দেখেন যে ঘরে সে ঘরে এয়ারকুলার লাগানো। ডিসটেম্পার করা নীল দেয়ালের ঠাণ্ডা ঘর। পর্দার রঙ নীল। দেয়ালে দুটি ছবি আছে। দু'টির বিষয়বস্তুও নীল। একটায় নীল সমুদ্র, একটায় নীল আকাশ। এই প্রসঙ্গে ছোটচাচার বক্তব্য হচ্ছে — আমার এখন পিকাসোর মত ব্লু পিরিয়ড চলছে।

ছোট চাচার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হল। মেয়েটির নাম 'নিনি'। যে সব মেয়ের নিনি জাতীয় নাম হয় তারা সাধারণত খুব হাইফাই ধরনের হয়ে থাকে। ছোটচাচীও তাই। পুতুলের মত সুন্দর একটা মেয়ে যাঁর ঠোঁট দু'টো লিপিস্টিক ছাড় লাল টুকটুকে। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই ছোটচাচী কি রোগ বাঁধালেন কে জানে — দিনরাত কুঁ কুঁ। শরীরে তীব্র ব্যথা। সেই ব্যথাও বেশ অদ্ভুত ধরনের, হেঁটে চলে বেড়ায়। কখনো ব্যথাটা হাতে, কখনো পায়ে, কখনো পেটে। আমি এমন অদ্ভুত অসুখ কখনো দেখিনি, কারো হয়েছে বলেও শুনিনি। সব রকম চিকিৎসা হয়েছে, এখন চলছে দ্বৈব চিকিৎসা। ছাগলের মত দাড়িওয়ালা এক লোক বেতের টুপী মাথায় দিয়ে প্রতি মঙ্গলবার আসছে। ছোটচাচীর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কি সব ঝাড়-ফুক নাকি করছে। আলোচনা শুনতে পাচ্ছি — চাচীকে আজমীর শরীফে নিয়ে যাওয়া হবে। মনে হচ্ছে, চিকিৎসাশাস্ত্র পুরোপুরি ফেল করেছে। তবে খুব লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই প্রচণ্ড অসুখ-বিসুখে তাঁর চেহারা বা স্বাস্থ্যের কোন এদিক-ওদিক হচ্ছে না। আগে যেমন ছিলেন এখনো তেমন আছেন। বরং ঠোঁট এবং গাল দুইই আরো বেশি লালচে হয়েছে।

নাস্তা শেষ করে সিগারেট হাতে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দা হল আমার স্মোকিং কর্নার। বারান্দা এবং ছাদ। বেশির ভাগ লোকই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা

বসে সিগারেট টানতে ভালবাসে, আমার ভাল লাগে হেঁটে হেঁটে টানতে। সিগারেট অবশ্যি ধরানো গেল না। জলন্ত সিগারেট চট করে লুকিয়ে ফেলতে হল। কারণ বাইরের বারান্দায় ছোটচাচা বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে নার্সের পোশাক পরা মিস নমিতা (কিংবা মিস সমিতা, এই মুহূর্তে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।)। এই নার্সটির বয়স খুবই অল্প। চেহারা ভাল না। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তবু ধবধবে সাদা নার্সের পোশাকে মেয়েটিকে চমৎকার লাগে। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। মিস নমিতা (অথবা সমিতা) এই বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন। ছোটচাচীর খুব বাড়াবাড়ি হলে তাঁকে আনা হয়। কাল রাতে নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে বলেই তাঁকে আনা হয়েছে। নিশ্চয়ই রাত জেগেছে। ঘন ঘন হাই তুলছে। জগতের কুৎসিততম দৃশ্যের একটি হচ্ছে মেয়েদের হাই তোলা, তবে এই মেয়েটিকে হাই তোলা অবস্থাতে তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না।

ছোট চাচা আমাকে দেখেই বললেন, যাচ্ছিস কোথায়?

আমি বললাম, মেজো খালুর বাসায়। বেচারা মারা গেছেন। শুনেছেন বোধহয়।

'হুঁ, শুনেছি। আনফরচুনেট ডেথ। আমার একবার যাওয়া উচিত। দেখি বিকেলের দিকে যদি সময় পাই। বিকেলে আবার একটা মিটিং পড়ে গেল।'

ছোট চাচা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে কথা বলছেন। আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার তো কোন দরকার নেই, তবু দিচ্ছেন কেন কে জানে। তিনি অকারণে খানিকক্ষণ খুক খুকও করলেন। নার্ভাস হলে তিনি এটা করেন। যে কোন কারণেই হোক তিনি আজ খানিকটা নার্ভাস। আমি বললাম, যাই চাচা। তিনি বললেন, আয়, তোকে খানিকটা এগিয়ে দেই। মগবাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত। ওখান থেকে রিকশা নিয়ে যাবি।

গাড়িতে আমরা চারজন উঠলাম। ছোটচাচা ড্রাইভিং সীটে, আমি তাঁর পাশে। পেছনের সীটে সমিতা এবং ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া। ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া এ বাড়িতে খুব সুখের চাকরি করছে। পুরো বেতন নিচ্ছে অথচ গাড়ি চালাতে হচ্ছে না। গাড়ি সব সময় ছোটচাচাই চালান। সে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে পেছনের সীটে বসে বসে ঝিমায়।

গাড়ি বড় রাস্তায় পড়া মাত্র ছোটচাচা বললেন, সমিতা, তুমি কোথায় নামবে? মেয়েটার নাম তাহলে সমিতা। নমিতা নয়। সমিতা মানে কি? কে জানে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সমিতা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। কেন জবাব দিল না কে জানে? প্রশ্ন শুনতে না পেলে ভিন্ন কথা, কিন্তু যদি শুনে থাকে তাহলে জবাব দেবে না কেন? রহস্যটা কি? শাহবাগের মোড়ে এসে ছোটচাচা গাড়ি থামিয়ে বললেন, কুদ্দুস, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও তো।

কুদ্দুস নেমে গেল।

কুদ্দুসের সঙ্গে নামল সমিতা। শীতল গলায় বলল, আমি এইখানে নামব। বলেই গট গট করে চলে গেল। সালাম দিল না বা বলল না, স্যার যাই। এর মানেটা কি?

কুদ্দুস সিগারেট কিনেছে কিন্তু ভাংতি দিতে পারছে না। তার হাতে পাঁচশ' টাকার একটা নোট। নোটটা নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান করছে।

ছোট চাচা বললেন, টুকু, একটা সমস্যা হয়েছে। তোকে বলা দরকার।

আমি বললাম, কি সমস্যা?

তিনি বেশ সহজ গলায় বললেন — এই সমিতা মেয়েটাকে আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি।

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, কবে?

সেটা এখনো ফাইনাল করিনি। কবে বিয়ে করব সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। বিয়ে করব সেটাই ইম্পর্টেন্ট।

বলেই ছোটচাচা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কারণ কুদ্দুস টাকার ভাংতি পেয়েছে। সে সিগারেট নিয়ে ফিরছে। আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, বাড়ির কেউ জানে?

'না। আমি বলব সবাইকে। লুকিয়ে রাখার মত তো কিছু না।'

ছোট চাচার গাড়ি উড়ে চলল। তিনি আস্তে গাড়ি চালাতে পারেন না। গাড়ি হু হু করে ছুটছে। আমি বসে বসে ঘামছি। কি সর্বনাশের কথা!

মেজো খালুরা একটি দু'তলা বাড়ির একতলায় থাকেন। বাড়ির নাম 'নীলা কুঠির'। অবশ্যি কুটির বানানটা ভুল করে লেখা — কুঠীর। ভুল নামের বাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় এই বাড়িতে ঝামেলা আছে।

'নীলা কুঠির' মেজো খালুর নিজের বাড়ি নয়। ভাড়া বাড়ি। উত্তর শাহজাহানপুরে তিনি চমৎকার একতলা একটা বাড়ি বানিয়েছেন। এ মাসের শেষ শুক্রবারে তাঁদের নিজ বাড়িতে উঠার কথা ছিল। মেজো খালু সে সুযোগ পেলেন না। তাঁদের বাড়ির সবাই দীর্ঘদিন এই নিয়ে বলাবলি করবে। মেজো খালুর প্রসঙ্গ উঠলেই বলবে, আহা, বেচারা নিজের বাড়িতে একরাত কাটাতে পারল না। কি ক্ষতি হতো কয়েকটা দিন পরে মারা গেলে! যেন আর ক'টা দিন পরে মারা গেলে এই মৃত্যু সহনীয় হত।

আমি লক্ষ করেছি সব মৃত মানুষকে নিয়ে একটা-না-একটা অতৃপ্তির গল্প চালু থাকে। কেউ হয়তো মৃত্যুর আগের দিন বলেছিল, "মা! খুব ঝাল দিয়ে পাবদা মাছ রাঁধ তো। খেতে ইচ্ছা করছে।" মা রাঁধেননি। এই দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। আজ তিনি শুধু পাবদা মাছ না কোন মাছই খেতে পারেন না।

মৃত লোকের চেয়ে তার অতৃপ্তির ব্যাপারটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। মৃত মানুষটির কথা কেউ বলে না। তার অপূর্ণ সাধের গল্প করে। আচ্ছা, এমন কেউ কি আছে মৃত্যু-মুহূর্তে যার কোন অপূর্ণ সাধ ছিল না? যে যাত্রা শুরু করে একজন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত এবং সুখী মানুষ হিসেবে?

আমি দাঁড়িয়ে আছি নীলা কুঠিরের গেটের বাইরে। আমার মনে উচ্চ শ্রেণীর সব

ভাব আসছে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। সকালের সিগারেটটি খাওয়া হয়নি। সিগারেট ধরাবার একটা চমৎকার জায়গা। সিগারেট ধরালাম। এবং 'সুখ' কি এই নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম। এইসব চিন্তা-ভাবনার বুদ্ধি বড় চাচার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি আমাদের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে এ জাতীয় ট্রেনিং ছেলেবেলায় দিয়েছেন — বুঝলি, যখন কিছু করার থাকবে না তখন চিন্তা শুরু করবি। ধর্, সুন্দর একটা গাছ দেখলি, তখন কি করবি? নিজেকে প্রশ্ন করবি — গাছটা সুন্দর লাগছে কেন? সৌন্দর্য ব্যাপারটা কি?

বড় চাচার ট্রেনিং-এ আমাদের আত্মার শক্তির কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে কি-না আমি জানি না তবে খানিকটা ভ্যাবদার মত যে হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই।

'কে, টুকু না?'

ফিলসফিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সরাসরি ধুলা-কাদার পৃথিবীতে চলে এলাম। প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি মেজো খালুর বড় ভাই। পর্যটনের বড় অফিসার। পর্যটনের অফিসাররা সব সময় খনিকটা সেজেগুজে থাকেন। তাঁদের দেখলেই মনে হয় এই বুঝি বেড়াতে যাচ্ছে। হয় পিকনিকে, নয় বিয়েবাড়িতে। এই ভদ্রলোক নিজের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও লাল টকটকে একটা টাই পরে এসেছেন। জুতা যেমন চক চক করছে, তাতে মনে হয় বুট পালিশওয়ালাকে দিয়ে পালিশ করানো। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে যা।" এঁর সঙ্গে আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠতা নেই যে তিনি আমাকে তুই তুই করে বলবেন। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন (নিকট কি দূরের) আমাকে তুই তুই করে বলে এবং দেখা হওয়ামাত্র কোন-একটা ফরমায়েস দিয়ে বসেন। সম্ভবত আমার চেহারায় চাকর-চাকর একটা ভাব আছে।

মেজো খালুর বড় ভাই পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সরু চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, তিনি এখন বলবেন — চট করে এক প্যাকেট বেনসন নিয়ে আয় তো। দেখবি যেন ড্যাম্প না হয়। সত্যি সত্যি ভদ্রলোক একটা একশ' টাকার নোট বের করে ইতস্তত করতে লাগলেন। আমি বললাম, কিছু আনতে হবে?

তিনি হাঁপ ছেড়ে বাচলেন। খুশি-খুশি গলায় বললেন, তিন কেজি চিনি নিয়ে আয় তো। ঘরে এক দানা চিনি নেই এদিকে লোকজন যারা আসছে, তাদের এটলিস্ট এক কাপ চা তো অফার করা দরকার। এর নাম সামাজিকতা। মরেও রক্ষা নেই, সামাজিকতা চালিয়ে যেতে হবে। হোয়াট এ সোসাইটি!

তিন কেজি চিনি কিনলাম। পঁয়ত্রিশ টাকা করে তিন কেজির দাম নিল একশ' পাঁচ টাকা। আমি দোকানদারকে বললাম, আমার কাছে একশ' টাকাই আছে। আপনি কি পাঁচটা টাকা কম রাখতে পারেন?

দোকানদার বলল — একদাম। এমনভাবে বলল যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাঁচ টাকা কমানোর প্রস্তাবে সে খুবই অপমানিত বোধ করছে। আমি বললাম, আপনি এক কাজ করুন, এখান থেকে পাঁচ টাকার চিনি কমিয়ে ফেলুন। দুই খবলা চিনি নিয়ে নিন। দোকানদার মনে হল এতে আরো অপমানিত বোধ করল। এক ধরনের মানুষই আছে যারা কথায়-কথায় অপমানিত বোধ করে। এদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় — ভাই কেমন আছেন? এরা অপমানে নীল হয়ে যায়। মনে করে তাদের দারুণ অপমান করা হল। এই দোকানদার বোধহয় সেই পদের। সে চিনি কমাল না। প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে মুখঝামটার মত একটা ব্যাপার করল। যেন তার পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেছে। আমি মনে মনে 'হারামজাদা' বলে বের হয়ে এলাম।

মরা-বড়ির দৃশ্য সচরাচর যা হয়, এ বাড়িতেও তাই। মেজো খালা কাত হয়ে একটা ইজি চেয়ারে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু একজন কে যেন প্রবল বেগে তালপাতার পাখায় তাকে বাতাস করছে। খালার মাথার সমস্ত চুল ভেজা। মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই মাথা ধুইয়ে দেয়া হয়েছে। পরিচিত যে-ই আসছে খালা খানিকক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন এবং বলছেন 'আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমরা আমাকে বিষ এনে দাও। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

আমার চট করে মনে হল খালাকে খানিকটা বিষ সত্যি সত্যি যদি এখন দেয়া হয় এবং বলা হয় — "এই যে বিষ এনেছি, নিন।" তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? খালা এই মুহূর্তে প্রবল শোকের যে ছবি দেখাচ্ছেন তার কতটা খাঁটি? আমি নিশ্চিত, মাসখানিকের মধ্যে তিনি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। ভিসিআর-এ ছবি দেখবেন। দুপুরে ঘুমুবেন। তরকারিতে লবণ কম হলে কাজের মেয়েটিকে বকাঝকা করবেন।

আমি তিন কেজি চিনির প্যাকেট নিয়ে খানিকটা দিশাহারার মত হয়ে গেলাম। কাকে দেব? বাড়ি গিজ গিজ করছে মানুষ। সবাই কথা বলছে। মেয়ে মহলের তিন ভাগের একভাগ শব্দ করে কাঁদছে। কয়েকজন মৌলানাকে আনা হয়েছে, যারা অতি দ্রুত কোরান খতম দিচ্ছেন। থার্টি থ্রি আরপিএম-এর রেকর্ড ফোর্টি ফাইভে দেয়া হয়েছে। এই বিরাট ঝামেলায় তিন কেজির প্যাকেট দেব কাকে?

খালুর বড় ভাইকে পাওয়া গেল। তিনি লাল টাই খুলে ফেলেছেন। তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখাচ্ছে। সামান্য একটা টাই যে মানুষকে এতটা বদলে দিতে পারে, আমার জানা ছিল না। লাল রঙের কাপড়ের টুকরাটার উপর আমার ভক্তি হল।

'চিনি এনেছ টুকু?'

'জ্বি।'

'গুড। মেনি থেংকস। ফেরত এসেছে কত?'

'ফেরত আসেনি। পঁয়ত্রিশ টাকা করে কেজি।'

'কি বলছ তুমি! ত্রিশটাকা কেজি সব জায়গায়। দশ টাকা ফেরত আসার কথা।'

ভদ্রলোক বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে — দশটা টাকা তুমি ম্যানেজ করে নিলে? এটা তো তোমার কাছ থেকে আশা করিনি?

তিনি বিরস মুখে বললেন, টেবিলের উপর রেখে দাও। আমি টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখলাম। ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় মেজো খালাকে আনা হয়েছে। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মেজো খালার অজ্ঞান হওয়া তেমন কোন বিশেষ ব্যাপার না। অতি সামান্য ব্যাপারেই তিনি অজ্ঞান হন। আমাদের বাসায় এসে একবার তিনি গরমে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর তাঁর জ্ঞান হল এবং তিনি বললেন — "এয়ার কন্ডিশন ঘরে থেকে থেকে শরীরের সিস্টেমটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ দিন গাওছিয়ায় গিয়েছিলাম, গরমে আর ভিড়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। এক শাড়ির দোকানে নিয়ে শোয়াল। বিশ্রী কাণ্ড!" আমার ছোট বোন মীরার ধারণা, মেজো খালার অজ্ঞানের ব্যাপারটা চমৎকার একটা অভিনয়-কলা। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এই অভিনয় তিনি প্রায় জায়গাতেই করেন এবং বেশ ভালই করেন। এখানেও তাই বোধহয় হচ্ছে। মেজো খালার মাথায় পানি ঢালছে তাঁদের একমাত্র মেয়ে রিমি। রিমি তার মায়ের মত রূপবতী হয়নি। খুবই সাদামাটা ধরনের চেহারা, তবে এই মেয়েকে দেখলেই মনে একটা স্নিগ্ধ ভাব হয়। মনে হয় সে এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে। তার গলার স্বরও বেশ অদ্ভুত। যখন কথা বলে তখন মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছে। খুব কাছাকাছি থাকলেও তার গলার স্বরের জন্যে তাকে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। রিমি আমার সমবয়েসী। বয়সে আমার তিন মাসের বড়। সে ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ফাইন্যাল দেবে। যদিও তার থাকার কথা এম. এ. ক্লাসে। সেশন জট সব গুবলেট করে ফেলেছে। মেজো খালা চোখ খুললেন। রিমি পানি ঢালা বন্ধ করে উঠে এল। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, টুকু, আমার সঙ্গে একটু আয় তো।

রিমির সঙ্গে আমার সম্পর্কে খানিকটা জটিলতা আছে। এই জটিলতার ব্যাপারটা পরে বলব।

রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকিয়েই দরজা ভিজিয়ে দিল। এটা সে সব সময় করে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হয় দরজা ভিজিয়ে দেয় নয় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। মেজো খালা এই ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই খুব অপছন্দ করেন। মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে তার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। খালা অপছন্দ করেন বলেই রিমি এই কাজটা বেশি বেশি করে।

'টুকু, চেয়ার টেনে বস।'

আমি বসলাম। রিমি বলল, অসম্ভব কান্না পাচ্ছে। আমি এখন চিৎকার করে কাঁদব। তুই চুপচাপ বসে থাকবি।

আমি কিছু বললাম না। বসে রইলাম। রিমিকে দেখলে মনে হয় সে খুব গোছালো ধরনের মেয়ে। আসলে তা নয়। তার ঘর সব সময়ই এলোমেলো। রিমি কাঁদল না। আমি জানতাম সে কাঁদবে না। আমি এখন কাঁদব বলার পর কেউ কাঁদতে পারে না।

'টুকু!'

'কি!'

'মা'র সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য যে কোন একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে বাবা আরো অনেক দিন বাঁচত।'

'এখন এসব কথা থাক।'

'আমি এই কথা শুধু আজই বলব, আর কোনদিন বলব না। আর বলব শুধু তোকে, আর কাউকে না।'

'আমাকে বলার কোন প্রয়োজন দেখছি না।'

'কথা বলিস না। তুই শুধু শুনে যা। হ্যাঁ হুঁ কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু শুনে যাবি – – আমার মা, বাবার জীবনটা একেবারে ভাজা ভাজা করে ফেলেছে। আমি যখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখনকার একটা ঘটনা বললেই তুই সবটা বুঝতে পারবি।'

'আমার বুঝে দরকারটা কি?'

'কেন শুধু কথা বলছিস? শুনতে অসুবিধা কি? আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, মরিয়ম নামের অল্পবয়েসী একটা কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটা দেখতে বেশ ভাল। একদিন রাতে আমরা সবাই খেতে বসেছি, বাবা বললেন, মরিয়ম, ফ্রীজ থেকে খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও তো।

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সব কাজের লোককে তুমি তুই তুই করে বল। মরিয়মকে তুমি করে বলছ কেন?

বাবা বিব্রত সুরে কি যেন বললেন। মা কঠিন গলায় বললেন, ওর সঙ্গে এত কি তোমার খাতির?'

'খাতিরের কি দেখলে?'

'ঐ দিন দেয়াশলাইয়ের খোঁজে তুমি রান্নাঘরে গেলে। দেয়াশলাইয়ের জন্যে তোমাকে রান্নাঘরে যেতে হবে কেন? দেয়াশলাই আনতে বললে কি ওরা এনে দিত না?'

'মেয়ের সামনে কি সব পাগলামি শুরু করলে?'

'সত্যি কথা বললে পাগলামি হয়ে যায়? তুমি আমাকে কি ভাব? আমি চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না? তোমার ফষ্টিনষ্টি, ছোঁক ছোঁক আমি বুঝি না? আমি

এখনও ফিডার দিয়ে দুধ খাই?

বাবা খাওয়া রেখে উঠে চলে গেল। ঘটনা এখানেও শেষ হল না। মা মরিয়মকে ডেকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বাবা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। মা মরিয়মকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বললেন, এইবার মনের সাধ মিটিয়ে ফষ্টিনষ্টি কর। এই বলেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে।'

রিমি কাঁদতে শুরু করল। সে চিৎকার করে কাঁদবে বলেছিল। সত্যি সত্যি সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

সে কাঁদবে না — আমার এই ধারণা ঠিক হল না। যতটুকু অবাক হবার দরকার আমি তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম। আমার নিজের ধারণার বাইরে যখন কিছু ঘটে তখন খুব অবাক হই। কারণ সচরাচর তেমন ঘটে না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটি মেয়ে কাঁদছে — এই দৃশ্য চুপচাপ দেখা যায় না। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মাথায় হাত দিতেই সে ঝট্‌কা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন স্টুপিড? মেয়েদের গায়ে হাত দিতে ভাল লাগে?

খালার বাড়িতে অল্প কিছু সময় থাকব বলে এসেছিলাম। থাকতে হল রাত দশটা পর্যন্ত। মরা-বাড়ির শতেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল। ট্রাক আনা, গোরস্তানে খোঁজ-খবর করা।

এর মধ্যে একবার মেজো খালুর বড় ভাই আবার একটা একশ' টাকার নোট দিয়ে বললেন — টুকু, চট করে এক প্যাকেট বিদেশী ফাইভ ফাইভ নিয়ে আয় তো।

আমি উদাস গলায় বললাম, আমাকে দোকানদাররা খুব ঠকায়, পাঁচ-দশ টাকা বেশি নেবে, অন্য কাউকে দিয়ে আনালে হয় না?

'আর কাউকে দেখছি না। তুই কাইন্ডলি যা।'

আমি চকচকে একশ' টাকার নোটটা নিয়ে বের হয়ে এলাম। মনে হল আর ফিরে না গেলে কেমন হয়? ব্যাটাকে সামান্য শিক্ষা দেয়া। সে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হবে। টাকা যাওয়ার শোকে পাথর হয়ে যাবে। হোক। অবশ্যি আমার কপালে চোর অপবাদ জুটবে। জুটুক। কি আর করা! বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এতক্ষণ যখন ছিলাম, মৃত মানুষটাকে কবরে শোয়ানো পর্যন্ত থেকে যাই। আমি সিগারেটের বদলে তিন কেজি চিনি কিনে ফেললাম।

'কই, সিগারেট এনেছ? দাও।'

আমি বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম, সিগারেট আনতে বলেছিলেন না-কি? মাই গড! আমি তো আবার তিন কেজি চিনি নিয়ে এসেছি।

মেজো খালুর সাজুগুজু করা ভাই হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, রাগে তাঁর পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে।

আমি বদলে নিয়ে আসছি। আপনি চিন্তা করবেন না। ঐ দোকানে সিগারেটও আছে। ইন দি মিন টাইম আপনার যদি খুব সিগারেটের তৃষ্ণা হয় আমার কাছ থেকে একটা নিয়ে খেতে পারেন।

'তুমি বদলে নিয়ে এস।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আমি ঠিক করে ফেললাম আধঘণ্টার মত হাঁটাহাঁটি করে ফিরে যাব। খুব ভাল মানুষের মত গলায় বলব, ফেরত নিল না। অনেক চেষ্টা করেছি। সোসাইটিটা নষ্ট হয়ে গেছে। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

২

সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দেখি একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সোফায় পা তুলে পদ্মাসন হয়ে বসে থাকা জলজ্যান্ত সন্ন্যাসী। বাংলাদেশে এই জিনিস দেখাই যায় না। যে দু'-একটা দেখা যায় তাও স্কুলের এ্যানুয়েল স্পোর্টসে 'যেমন খুশি সাজো' অংশে। কিন্তু যে সন্ন্যাসী বসে আছেন তাঁর মধ্যে সাজের কোন ব্যাপার নেই, খাঁটি সন্ন্যাসি। চুলে জট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া কাপড়। সোফায় হেলান দেয়া বিচিত্র এক লাঠি। সন্ন্যাসী আমাকে বললেন, ভাইয়া, আপনার কাছে দেয়াশলাই আছে?

সন্ন্যাসীর মুখে ভাইয়া ডাক মানায় না। ওহে বৎস-টৎস বললে হয়তো মানাতো। আমি তাঁকে দেয়াশলাই দিলাম। ভেবেছিলাম তিনি সিগারেট ধরাবেন, তা না করে তিনি দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে গভীর মনোযোগে কান চুলকাতে লাগলেন। কান চুলকানোর মত শারীরিক সুখের প্রতি সন্ন্যাসীদের মোহ থাকে জানতাম না। আমি বেশ কৌতূহল নিয়েই তাকিয়ে রইলাম।

এর আগমন কি জন্যে হয়েছে কে জানে। সম্ভবত চাচীর অসুখ সারানোর জন্যে। সব কিছুই তো হল, সন্ন্যাসীই-বা বাদ থাকে কেন?

আমি বললাম, আপনি এখানে, কি ব্যাপার? সন্ন্যাসী জবাব দিলেন না। ব্যাপার কি জানার জন্যে বাড়ির ভেতর চলে গেলাম।

আমাদের বসার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট ঘরটায় আমার ছোট দু'বোন — মীরা এবং নীরা পড়ে। দু'জনেরই সামনে পরীক্ষা। এই সময় এদের বই চোখের সামনে নিয়ে বসে থাকার কথা। আজ কেউ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, শুধু এরাই যে নেই তাই না, পুরো একতলায় কোন মানুষজন নেই। লক্ষণ মোটেই সুবিধার নয়। মনে হচ্ছে ছোটচাচীর কিছু-একটা হয়ে গেছে। কিংবা হতে যাচ্ছে। সবাই ভিড় করেছে দোতলায়। ফলস্ এ্যালার্ম কিনা কে জানে। ইদানিং মাসের মধ্যে দু'-একবার ছোটচাচী ফলস্ এ্যালার্ম দিচ্ছেন। মরি মরি করেও মরছেন না।

আমি ভেতরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, কি করব ঠিক বুঝতে পারছি না। দোতলায় যাব? না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আমার ঘর তিনতলার ছাদে। চুপি চুপি নিজের ঘরে চলে যাওয়া যায়। তবে তারও সমস্যা আছে। ভাত খাওয়ার জন্যে আবার একতলায় নেমে আসতে হবে। এই বাড়ির রান্না এবং খাবার ঘর একতলায়, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জন্যে তিনতলা এবং দোতলায় খাবার যায়, যেমন বড় চাচা তিনতলায় থাকেন, তাঁর জন্যে খাবার যায়। ছোটচাচা থাকেন দোতলায়, তাঁর জন্যেও যায়, তবে সব দিন না। বেশিরভাগ সময়ই তিনি নিচে খেতে আসেন।

বারান্দা থেকে আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। উপরে ওঠার সিঁড়ি এই ঘরেই। বাইরে দিয়েও একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির মুখের কলাপসেবল গেট অবশ্যি সব সময় তালাবন্ধ থাকে। খাবার ঘরে পা দেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল। আমি বললাম, দোতলায় কিছু হচ্ছে না কিরে?

মীরাকে কোন প্রশ্ন করলে কখনো তার সরাসরি জবাব দেয় না। সে বলল, কিছু হবার কথা নাকি?

'ছোটচাচীর শরীর ভাল তো?

'আমি কি করে বলব, আমি কি ডাক্তার?'

মীরার কথাবার্তা থেকে ধরে নেয়া যায় যে ছোটচাচী ভালই আছেন। সন্ধ্যার ঠিক মুখোমুখি একতলা যে পুরো খালি তার পেছনে কোন কারণ নেই।

আমি মীরার পেছনে পেছনে রান্নাঘর পর্যন্ত এলাম। সে চা বানাতে যাচ্ছে বোধহয়। পরীক্ষার সময় মীরার খুব ঘন ঘন চা খেতে হয়। সে আবার অন্যের বানানো চা খেতে পারে না। বার বার নিজেই বানায়।

'বসার ঘরে একটা সন্ন্যাসী বসে আছে, দেখেছিস নাকি মীরা?'

'হুঁ।'

'ব্যাটা কে?'

'ভোলা বাবু।'

'ভোলা বাবু এখানে কি চায়?'

'জানি না কি চায়। বড় চাচার কাছে আসে। গুজ গুজ করে কি-সব বলে।'

'চা বানাচ্ছিস নাকি?'

'হুঁ।'

'আমাকে এককাপ দিতে পারবি?'

'না।'

মীরা চুলায় কেতলি চাপিয়ে মেপে এককাপ চায়ের পানি দিল, এর পরেও রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে দেখাতে হবে যে মীরার এই ব্যবহারে আমি মোটেই আহত হইনি।

'তোর পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?'

'যে রকম হবার সে রকমই হচ্ছে।'

'তুই কি স্বাভাবিকভাবে কোন কথাই বলতে পারিস না?'

'না।'

'মা কোথায়?'

'জানি না। বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে।'

আমি বসার ঘরে চলে এলাম। তিনতলায় উঠা আপাতত স্থগিত। মা'র সঙ্গে কথা বলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তারপর যা হয় করা যাবে। এই সময়টা বরং সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলা যাক।

সন্ন্যাসী এখনো কান চুলকাচ্ছেন। এদের মত মানুষও তাহলে জাগতিক আনন্দে অভিভূত হন? আশ্চর্য!

'আপনার দেয়াশলাই-এর কাজ শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে। নেন ভাইয়া।'

'কত দিন ধরে আপনি সন্ন্যাসী?'

'জন্ম থেকেই। গেরুয়া ধরলাম ছয় বছর আগে। তার আগে নাঙ্গা বাবার শিষ্য ছিলাম কাপড় ছাড়া।'

'পুরো দিগম্বর? না নেংটিফেংটি ছিল?'

'কিছুই ছিল না।'

'লজ্জা করত না?'

'প্রথমে দুই-একদিন করল, তারপর দেখি আর করে না। নাঙ্গা থাকলে শরীরটা ভাল থাকে। অসুখ-বিসুখ হয় না। যে একবছর নাঙ্গা ছিলাম জর-জারি সর্দি-কাশি কিছুই হয় নাই।'

'নাঙ্গা থাকলেই পারতেন, কাপড় ধরলেন কেন?'

'ঠিকই বলেছেন, আবার নাঙ্গা হতে ইচ্ছা করে। কাপড় গায়ে কুটকুট করে, সহ্য হয় না।'

মীরা দরজার পর্দা ধরে দাঁড়াল। থমথমে গলায় বলল, দাদা, চা নিয়ে যা। আমি খানিকটা বিস্মিত হলাম। মীরা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শেষ পর্যন্ত করুণা করবে, এটা মনে হয়নি।

'শুধু আমার জন্যে আনলি? সন্ন্যাসী বেটার জন্যে আনলি না? ওকে সামনে রেখে খাব?'

'ও এই বাড়িতে কিছু খায় না।'

'তাই নাকি? কারণ কি?'

'জানি না।'

আমি চা নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনে বসলাম। সে এখন অতি দ্রুত পা নাচাচ্ছে। কিছু

কিছু মানুষ পা নাচানোর এই ব্যাপারটা অতি দ্রুত করতে পারে।

'আপনি শুনলাম এই বাড়িতে কিছু খান না।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'কারণ জানতে পারি?'

'যেসব বাড়িতে পাপকার্য হয়, সেসব বাড়িতে আমি খাদ্য গ্রহণ করি না।'

'এই বাড়িতে পাপকার্য হয়?'

'হুঁ, হয়।'

'ফাজলামি করছেন নাকি?'

'না।'

'আমার তো মনে হয় করছেন।'

'না। করছি না। আমি সন্ন্যাসী মানুষ। ফাজলামি করব কেন?'

প্রচণ্ড একটা ধমক দেব দেব করেও শেষ পর্যন্ত দিলাম না। ধমকাধমকি আমার স্বভাবে নেই। ব্যাটা যদি মনে করে এই বাড়িতে প্রচুর পাপকার্য হয় তাহলে মনে করুক, কিছুই যায় আসে না।

'কি ধরনের পাপকার্য এ বাড়িতে হচ্ছে?'

'তা তো আপনারাই ভাল জানেন।'

'জানি না বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।'

সন্ন্যাসীর কিছু বলার সুযোগ হল না। বড় চাচা ঢুকলেন। তাঁর হাতে বাজারের দুটো প্রকাণ্ড থলি। বড় চাচার পেছনে মা। মা'র পেছনে ইরা। এই প্রসেশন — এর অর্থ হল — আজ বুধবার, সাপ্তাহিক বাজারের দিন। সাপ্তাহিক বাজার চাচা নিজে করেন এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে করেন। সেই দিন তাঁর সঙ্গে দু'-তিনজন থাকতে হয়। যাদের কাজ হচ্ছে তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরা এবং যখনই তিনি কিছু কেনেন তখন বলা — জিনিসটা সস্তায় কেনা হয়েছে।

বড় চাচা সন্ন্যাসীকে দেখে বিরক্তমুখে বললেন, আজ আপনি এসেছেন কেন? আপনাকে বলেছি না বুধবারে কখনো আসবেন না। সেটা বলার পরেও দেখি প্রতি বুধবার এসে বসে থাকেন। এর মানে কি?

'দিনক্ষণ আমার খেয়াল থাকে না স্যার।'

গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর মুখে স্যার শব্দটা একেবারেই মানায় না। সন্ন্যাসীর মধ্যেও আজকাল সম্ভবত ভেজাল ঢুকে গেছে।

'স্যার, আমি কি চলে যাব?'

'হুঁ, চলে যান। বুধবারে কখনো আসবেন না। নেভার।'

'আচ্ছা। বুধবার বাদ দিয়েই আসব। আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে বুধবারও যা বৃহস্পতিবারও তা। সব সমান।'

'যখন-তখন আসারও দরকার নেই। আমি খবর পাঠালে তবেই আসবেন।'

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। সবে বাজার এসেছে। দুটোর আগে আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া যেতে পারে।

আগেই বলেছি, আমার ঘর তেতলার ছাদে। এটাকে ঘর বলাটা ঠিক হবে না। জিনিসপত্র রাখার জন্যে চিলেকোঠার মতো একটা ব্যাপার আছে, যার ছাদ করোগেটেড টিনের। দিনের বেলা এখানে ঢোকা যায় না। গরমে টিন তেতে থাকে। তবে রাত আটটা-ন'টার পর খুব আরাম। একটাই অসুবিধা — জানালা নেই বলে দরজা খুলে রাখতে হয়। রোজই ঘুমুবার সময় একটু ভয়-ভয় লাগে। যদি ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে ছাদে চলে যাই! আমাদের তেতলার ছাদে এখনও রেলিং হয়নি। বর্ষার সময় ছাদ খুব পিচ্ছিল হয়ে থাকে।

শার্ট খুলে বিছানায় এলিয়ে পড়তেই মা ঢুকলেন। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে বসলাম। তিনি সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে কখনো আমার ঘরে আসেন না। যখন আসেন তখন বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুতর। আমি বললাম, কি ব্যাপার মা?

মা তেমন ভনিতা করতে পারেন না। সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে আসেন। আজও তাই করলেন। শীতল গলায় বললেন, তোর ছোটচাচার ব্যাপার কিছু জানিস?

'কোন ব্যাপার?'

'ঐ নার্স মেয়েটার সঙ্গে ওর কিছু আছে নাকি বল তো?

'আমি কি করে বলব?'

'তোর এই ছাদে এসেই তো দু'জন ঘোরাঘুরি করে। তুই জানবি না কেন?'

'দু'জন ছাদে আসে তোমাকে বলল কে?'

'ইরা বলেছে।'

'ইরা বললে মোটেই পাত্তা দিও না। ইরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে।'

'তোর ছোটচাচাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে কেন?'

'তাছাড়া ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়, তোমার তো কিছু করার নেই। ছোটচাচা কচি খোকা না। সে যদি মনে করে সমিতাকে বিয়ে করবে তাহলে করবে। এটা তার ব্যাপার।'

'সমিতা আবার কে?'

'নার্সটার নাম সমিতা।'

'বিয়ে করার কথা আসছে কেন?'

'প্রেম হলে বিয়েও হতে পারে।'

'তোর ছোটচাচা কি তোকে কিছু বলেছে?'

আমি অতি দ্রুত চিন্তা করলাম সত্যি কথাটা মা'কে বলব, না কি বলব না।

ছোটচাচা আমাকে যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এই ভেবেই বলেছেন যে আমার মাধ্যমে খবরটা আস্তে আস্তে ছড়াবে। এইসব ব্যাপার সরাসরি বলার চেয়ে ভায়া মিডিয়াম বলা অনেক নিরাপদ। আর বলতেই যখন হবে বাড়িয়ে বলাই ভাল। বিয়ে হয়ে গেছে বলে দেখা যাক কি রিএ্যাকশন হয়।

'কথা বলছিস না কেন? কিছু বলেছে?'

'হুঁ।'

'কি বলেছে?'

'সমিতাকে বিয়ে করেছেন এই রকম একটা কথাই মনে হল শুনলাম।'

'ফাজলামি করছিস কেন?'

'মোটেই ফাজলামি করছি না।'

মা আমার বিছানার এক পাশে বসে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। তার প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ছোটচাচা ছাদে উঠে এসে বললেন, ভাবী আছেন নাকি? একটু আসুন তো, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

ছোটচাচা মার সঙ্গে কথা বলছেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। আমার ঘর থেকে তাঁদের কথা শোনা যায় না, কাজেই আমি সিঁড়ির দরজার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে এলাম। নিঃশব্দে চলাফেরাটা আমি বেশ ভাল পারি।

ছোটচাচাকে মনে হল খুবই স্বাভাবিক। সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছেন। প্রতিটি শব্দ বেশ স্পষ্ট, তবে মাঝে মাঝে তিনি এমন নিচু পর্দায় চলে যাচ্ছেন যে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই তুলনায় মা-র গলা ভয়াবহ। এমন চেঁচামেচি করছেন যে একতলার লোকজনও শুনতে পাচ্ছে বলে আমার ধারণা। মা এই ব্যাপারটা খুব সম্ভব ইচ্ছা করেই করছেন। একই সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েরা খুব বুদ্ধি খাটাতে পারে। তাঁদের কথোপকথনের ধরনটা এ রকম —

ছোটচাচা ঃ আস্তে কথা বলুন ভাবী, চেঁচাচ্ছেন কেন?'

মা ঃ তুমি অকাম-কুকাম করবে আর আস্তে কথা বলব আমি? তুমি পেয়েছ কি?

ছোটচাচা ঃ চিৎকার করে লাভ তো কিছু হচ্ছে না।

মা ঃ এর মধ্যে লাভ লোকসান কি? তুমি বৌ থাকতে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছ। সেই বৌ এখন যায় তখন যায়।

ছোটচাচা ঃ বিয়ের কথা কোত্থেকে এল? কি মুশকিল। ভাবী প্লীজ, চেঁচাবেন না।

মা ঃ চেঁচাব না মানে? চেঁচানির তুমি দেখেছ কি? দরকার হলে গোটা ঢাকা শহর আমি ঢোল দিব। মাইক ভাড়া করব।

ছোটচাচা ঃ করুন আপনার যা ইচ্ছে।

রঙ্গমঞ্চ থেকে ছোটচাচা প্রস্থান করলেন। মা খানিকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে থপ থপ করে উঠে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জমিদার গিন্নীদের গলায় বললেন, শুনেছিস কিছু?

আমি বললাম, না। কি ব্যাপার?

'তোর ছোটচাচা ঐ নার্স বেটিকে বিয়ে করে ফেলেছে। তুই যা বলেছিস তাই।'

মা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। দম নিচ্ছেন। চিৎকার করে দম ফুরিয়ে গেছে। মা'র দম ফিরে এলে তিনি টানা গলায় বললেন, 'আমার মনে হয় ঘটনাটা অন্য।'

'ঘটনাটা অন্য মানে?'

'এমন কিছু-একটা হয়েছে যে বিয়ে না করে উপায় নেই। প্রেম-ফ্রেম কিছু না।'

আমি মা'র বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলাম। মাঝে মাঝে মা এমন বুদ্ধির ঝিলিক দেখান। উদাহরণ দেই। অরুণা নামে মীরার এক বান্ধবী আছে। কলেজের বান্ধবী। প্রায়ই টেলিফোন করে। প্রথমে সে চায় আমার মা'কে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে। কেমন আছেন খালাম্মা? আজ কি রান্না করেছেন? তারপর তার গল্প শুরু হয় মীরার সঙ্গে। সেই গল্প আর শেষ হতে চায় না। একদিন এরকম গল্প চলছে, মা এসে ফট করে মীরার হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে কানে ধরলেন। ওপাশ থেকে মিষ্টি মিষ্টি গলায় একটা ছেলে কথা বলছে। মা টেলিফোন রেখে বজ্রকণ্ঠে বললেন, মীরা! এ হারামজাদা কে? কে এই হারামজাদা? আর অরুণাই-বা কে?

মীরা ছুটে পালিয়ে গেল। আমরা মীরার কাণ্ডকারখানায় হলাম বিস্মিত, মা'র বুদ্ধি দেখে হলাম চমৎকৃত। মীরা অবশ্যি কিছুদিন বেশ যন্ত্রণা দিল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমাদের কাজের ছেলেকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দশটা ঘুমের ট্যাবলেটও কিনে আনল। মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, ঐ ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। বি.এ.-টা পাস করুক।

ঐ ছেলে বি.এ. পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে যাওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। মীরার প্রেম বাতাসে উড়ে গেল। কম্পার্টমেন্টাল পাওয়া ছেলেদের প্রতি মেয়েদের প্রেম থাকে না।

যাই হোক, পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। রাতে নিচে খেতে গিয়ে দেখি, ছোটচাচার ব্যাপারটা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছে।

মীরা বলছে, আমি যা আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ইদানিং কেমন সেজেগুজে আসছিল।

এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা। সমিতা এ বাড়িতে সব সময় নার্সের পোশাক পরে আসে। বাড়তি কোন রকম সাজসজ্জা তার নেই। সে আসে, নিজের মনে কাজ করে

যায়। তাকে নিয়ে আমার বোনেরা যেসব কথাবার্তা বলে তা হচ্ছে — কি দেমাগ! চার পয়সা দামের নার্সের এত দেমাগ হয় কি করে! তাও যদি চেহারাটা ভাল হত। আবলুস কাঠের মতো গায়ের রঙ। ঠোঁট দু'টা পুরুষদের ঠোঁটের মত মোটা।

এসব কথার কোনটাই সত্যি নয়, সমিতার গায়ের রঙ কাল, এবং ঠোঁট দুটাও মোটা, তবু এই মেয়ের দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে হয়। মীরা এবং ইরা যে এত কথা বলে তার কারণ সম্ভবত ঈর্ষা।

খাবার টেবিলে ছোটচাচাকে নিয়েই আলাপ চলতে লাগল। টেবিলে আছি শুধু আমরা অর্থাৎ মীরা, ইরা এবং বাবা। মা খাবার-দাবার এগিয়ে দিচ্ছেন এবং রাগে গন গন করছেন। মীরা-ইরা কিছুক্ষণ পর পর বলছে, এরকম একটা কুৎসিত কাজ কি করে করল! নার্স বিয়ে করে ফেলল — ছিঃ! এক পর্যায়ে বাবা বললেন, থাম্ তো। একটা ব্যাপার নিয়ে এত কথা! বিয়ে যে করেই ফেলেছে এমন তো নাও হতে পারে। এই নিয়ে আর কোন ডিসকাসন যেন না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে গেল। কোন কারণ ছাড়াই আমরা বাবাকে বেশ ভয় পাই। এর মধ্যে মা-ও আছেন। তিনি ভয় পান সবচে' বেশি।

বাবা ডাল দিয়ে ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন, এসব হচ্ছে পারিবারিক স্ক্যান্ডেল। ধামাচাপা দিতে হবে। মা ক্ষীণ গলায় বললেন, বিয়ে করে বসে আছে, এই জিনিস তুমি ধামাচাপা দেবে কিভাবে?

বাবা এমন ভঙ্গিতে মা'র দিকে তাকালেন যেন মা'র মূর্খতায় তিনি খুবই বিস্মিতবোধ করছেন। এই দৃষ্টিটি তিনি কোত্থেকে শিখেছেন কে জানে, তবে খুব ভাল শিখেছেন। এই দৃষ্টির মুখোমুখি আমাদের প্রায়ই হতে হয়। এবং আমরা খুবই সংকোচিত বোধ করি।

বাবা হাত ধোবার জন্যে উঠতে উঠতে বললেন, সমস্যা যেমন আছে, সমস্যার সমাধানও আছে। আসগরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

জাজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়ে এজলাস থেকে নেমে গেলেন এরকম ভঙ্গিতে বাবা নিজের ঘরে রওনা হলেন। আমি ছোটচাচাকে খবর দিতে গেলাম।

ছোটচাচা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। বারান্দায় আলো নেই বলে তাঁর মনের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে বসে আছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে মন ভাল নেই। যাদের মন হাসিখুশি তারা বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে পারে না।

'কি করছ চাচা?'

'কিছু করছি না। আঁধারের রূপ দেখছি। আচ্ছা, তুই কি বিয়ে নিয়ে কিছু বলেছিস? আমি সমিতাকে বিয়ে করে ফেলেছি এই জাতীয় কিছু?'

'বলেছি।'

ছোট চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভালই করেছিস। বিয়ে করে

ফেললে কি রিএ্যাকশন হবে এ্যাডভান্স জানা গেল।

'তোমাকে বাবা ডাকছেন।'

'কেন?'

'কোর্ট মার্শাল হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'বলে আয় ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'খাওয়া-দাওয়া করেছ?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর তো — ছোটচাচীর ঘরে যা।'

'কি করব ঘরে গিয়ে?'

'দেখে আয় সে ব্যাপারটা শুনেছে কি-না।'

'আমার মনে হয় শুনেননি।'

'মনে হওয়া-হওয়ি না — তুই জেনে আয়।'

আমি ছোটচাচীর ঘরের দিকে রওনা হলাম। তাঁর ঘরে ঢোকার অনেক সমস্যা আছে — খালি পায়ে ঢুকতে হয়। ছোটচাচী দিনের মধ্যে সতেরো বার মেঝেতে পা ঘষে ঘষে দেখেন বালি কিচমিচ করছে কি না। ছোটচাচীর ভাষায় তিনি পৃথিবীর সব কিছু সহ্য করতে পারেন, তবে মেঝেতে বালি থাকলে তা সহ্য করতে পারেন না।

ছোটচাচীর ঘরে আসবাবপত্রও তেমন নেই। কারণ, শোবার ঘরে তিনি আসবাবপত্র সহ্য করতে পারেন না, তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। তাঁর প্রকাণ্ড ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা খাট। একপাশে গোল একটা টেবিল। সেই গোল টেবিলের মাঝখানে কাঁচের ফুলদানিতে দু'টা গোলাপ। এই গোলাপ আসে তাঁর বাবার বাড়ি থেকে। ছোটচাচীর বাবা রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেব বর্তমানে গোলাপের চাষ করেন। ঢাকা শহর গোলাপ সমিতির তিনি সহ-সভাপতি। তাঁর বাগানে একান্নটা গোলাপের গাছ আছে। তিনি প্রতিদিন বাগানের গোলাপ তাঁর চার মেয়ের বাসায় দু'টা করে পাঠান। সাইকেলে করে একটা শুটকো লোক গোলাপ দিয়ে যায়। এমনভাবে দেয় যেন সাত রাজার ধন দিয়ে যাচ্ছে। একবার আমার হাতে দিয়ে বলল, একটু কেয়ারফুলি ধরুন ভাই। আমি বললাম, কেন? বিষাক্ত না-কি? লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হল।

পুরো ব্যাপারটা কেন জানি আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেবের এই গোলাপপ্রেমের বিষয়টি লোক-দেখানো বলেই আমার ধারণা। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি গদ গদ ভঙ্গিতে গোলাপ সম্পর্কে এত সব কথা বলেন যে রাগে গা জ্বলে যায়। শেষবার যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন, জানো টুকু, ঘুমুবার আগে গোলাপের ঘ্রাণ না নিলে আমার ভাল ঘুম হয় না।

আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, যেদিন সর্দি থাকে সেদিন কি করেন? নিশ্চয়ই

ঘুমের খুব অসুবিধা হয়।

জাজ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে চাইলেন আমি ঠাট্টা করছি কি-না। আমি খুবই সরল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলাম যেন সত্যি সত্যি জানতে চাই সর্দি হলে উনি কি করেন। রিটায়ার্ড জাজ সাহেবের শেষ পর্যন্ত ধারণা হল, আমি ঠাট্টা করছি না। জাজ সাহেবরা কে সত্যি কথা বলছে কে বলছে না, তা কখনো ধরতে পারেন না।

তিনি বললেন, সর্দি জ্বরজ্বারি এইসব আমার কখনো হয় না। গোলাপের ঘ্রাণে সম্ভবত রোগ-প্রতিরোধী কোন কিছু আছে। এটা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে সবচে' কম গবেষণা হয়েছে তা হচ্ছে 'গন্ধ'। **The science of smell.**

গোলাপপ্রেমী বাবার কন্যার অর্থাৎ আমার ছোটচাচীর গোলাপ-প্রেম নেই। তিনি ফুল শুঁকে দেখেন না, কারণ ছোটবেলায় একবার টগর ফুল শুঁকেছিলেন, গন্ধের সঙ্গে সেই ফুলের ভেতর থেকে আধইঞ্চি লম্বা শূয়োপোকা তাঁর নাকের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছোটচাচী বিছানা থেকে উঠে বসলেন। ঘটনাটা তিনি জানেন কি না তাঁকে দেখে তা বুঝতে পারলাম না। তাঁর গায়ে রাত-পোশাক। সেই নীল রঙের রাত-পোশাক এতই স্বচ্ছ যে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

ছোটচাচী মিষ্টি গলায় বললেন, কি ব্যাপার টুকু?

'কিছু না। আপনার খবব নিতে এলাম। শরীর কেমন?'

'শরীর ভালই। আজ বুধবার না? শরীর খারাপ থাকবে কেন?'

এই আরেকটি মজার ব্যাপার — সপ্তাহে তিনদিন ছোটচাচীর শরীর ভাল থাকে -- বুধবার, শনিবার এবং সোমবার। বাকি চারদিন খুবই খারাপ। সপ্তাহের দিনক্ষণ দেখে শরীর খারাপ হয় কি করে, এটা একটা রহস্য।

'যাই চাচী।'

'তুমি কি শরীরের খোঁজ নিতে এসেছিলে?'

'জ্বি।'

'এর আর খোঁজ নেবার কিছু নেই। শরীর আমার সারবে না। **My days are numbered.**'

'চিকিৎসা তো হচ্ছে।'

'এর কোন চিকিৎসা নেই। যত দিন যাচ্ছে গয়ের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় কোন স্কিনে কোন অনুভূতি নেই। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না, তাই না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? হয়।'

'উঁহুঁ, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা একদিন আমার বুকের স্কিন তোমাকে

দেখাব। নাকি এখনই দেখবে?'

'না থাক।'

'এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ডাক্তারকে যদি দেখাতে পারি, তোমাকে দেখাতে অসুবিধা কি? আমার এত লজ্জাটজ্জা নেই।'

আমি ছোটচাচীর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। এই চাচীর সঙ্গে বেশি সময় থাকা খুবই বিপজ্জনক। এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ্য করেছি। একবার সন্ধ্যাবেলা কি কারণে যেন তাঁর ঘরে ঢুকেছি। ছোটচাচী ঘরে নেই। লাগোয়া বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে গোছল করছেন। বাথরুমের দরজা হাট করে খোলা। চাচী বললেন, কে, টুকু নাকি?

'হ্যাঁ।'

'কাইন্ডলি তোয়ালেটা দিয়ে যাবে? চোখ বন্ধ করে এসো। আমার গায়ে কিন্তু কাপড় নেই।'

ঘর থেকে বেরুতেই ছোটচাচার সঙ্গে দেখা। তিনি সম্ভবত ছোটচাচীর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, ছোট চাচী এখনো কিছু জানেন না।

'ঠিক বলছিস তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।'

'গুড। আমি নিজেই তাহলে বলব। তোর কাছে সিগারেট থাকলে আমাকে দিয়ে যা।'

'যা করবে বুঝে-সুঝে করবে।'

'তোর উপদেশের যখন প্রয়োজন বোধ করব তখন জানাব। এই মুহূর্তে আমার প্রয়োজন নেই।'

আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করছি। ছোটচাচা তা না নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি পড়ার শব্দ হল।

ঘুমুতে যেতে অনেক দেরি হল। বড়চাচা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি অসাধারণ বই পেয়েছেন। আমাদের পড়ে শোনাবেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল -- বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনা তিনি কিছুই জানেন না। অবশ্যি না জানার কোন কারণ নেই। বড়চাচার সেবা-যত্নের জন্যে কমলা নামের যে মেয়েটি আছে সে দুর্দান্ত স্পাই। কোথায় কি হচ্ছে টুক করে তাঁর কানে তুলে দেয়।

মীরা, ইরা এবং আমি — তিনজনই এসেছি। মীরা বলল, পরীক্ষার পড়া করতে হবে, আজ থাক। বড় চাচা বললেন, আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না। একটা মাত্র চ্যাপ্টার পড়ব। চ্যাপ্টারটার শিরোনাম হল ইনফিনিটি এন্ড মাইন্ড। অসাধারণ জিনিস। ভাবছি, অনুবাদ করে ফেলব। দশজনে পড়বে। এতে সমাজের একটা উপকার হবে। কমলা, আমাদের জন্য কফি বানাও তো।

চা এবং কফির সরঞ্জাম বড়চাচার ঘরেই থাকে। কমলা ইলেকট্রিক হিটারে পানি গরম করে ব্রেন্ডারে চমৎকার এক্সপ্রেসো কফি তৈরি করে। বড়চাচার ঘরে মাঝে মাঝে আমি কফির লোভেই আসি। এমিতে বোকা মানুষের সঙ্গ আমার বিশেষ ভাল লাগে না। বড়চাচা শুধু বোকা তাই না, বেশ বোকা। তিনি ছাড়া এই তথ্যটি সবাই জানে। কমলাও জানে।

কি, পড়া শুরু করব? ফুল এ্যাটেনশনে শুনবি। পড়ার সময় কাশাকাশি হাসাহাসি যেন না হয়। কারুর বাথরুমে যাবার ব্যাপার থাকলে এক্ষুণি সেরে আয়।

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। ফিরলাম খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে। বাথরুমের লাল বালতিতে কমলার শাড়ি। সে কি বড় চাচার বাথরুম ব্যবহার করে? তা তো করার কথা না। তাদের বাথরুম আলাদা।

কমলা কফির কাপ এনে হাতে দিল। তার গা থেকে ভুড় ভুড় করে গন্ধ আসছে? গায়ে সেন্ট দিয়েছে বোধহয়।

কমলার বয়স কত? ত্রিশ না কি আরো কম?

বড়চাচা বললেন, কমলা, তুমিও খাও। সবাইকে বানিয়ে দেবে, নিজে খাবে না এটা তো ভাল কথা না। খাও, তুমি খাও। আই ইনসিস্ট।

৩

একজন মৃত মানুষকে ভুলে যেতে আমাদের কত দিন লাগে?

তীব্র শোক কাটতে লাগে দু'দিন, তীব্র শোকের পরের অংশ ভোতা শোক কাটতে দশ দিনের মত লাগে। কোন রকমে পনেরো দিন কাটিয়ে দিতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তখন আর মৃত মানুষদের কথা মনেই থাকে না। মানুষ অতি উন্নত প্রাণী বলেই 'শোক' পনেরো দিনের মত ধরে রাখে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা চব্বিশ ঘণ্টার বেশি ধরে রাখতে পারে না।

আমাদের কাজের মেয়েটি একবার ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে বিড়ালের তিনটা বাচ্চা মেরে ফেলল। মা-বিড়ালটা পাগলের মত হয়ে গেল। নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে একেকজনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ছে, ছটফট করছে। মা-বিড়ালের দুঃখ দেখে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম। কাজের মেয়েটাকে তার নৃশংসতার জন্যে মাসের পুরো বেতন দিয়ে বরখাস্ত করা হল। সে হাসিমুখে তার টিনের স্যুটকেস নিয়ে মীরপুরে চলে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পর দেখা গেল মা-বিড়াল তার সন্তান-শোক ভুলে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করছে। বিকেলে রোদে শুয়ে আরামে হাই তুলছে। এদিকে মতির মার অভাবে সংসার হয়েছে অচল। ঢাকা শহরে কাজ করতে পারে, এ রকম কাজের মেয়ে বাঘের চোখের মতই দুর্লভ। কাজেই পরদিন সকালে আমি নিজেই মতির মা'কে আরো কুড়ি টাকা বেশি বেতন কবুল করে নিয়ে এলাম। তিনটি শিশু-হত্যার

জন্য মতির মা'র কুড়ি টাকা বেতন বেড়ে গেল। মাস চারেকের মধ্যে মা-বিড়ালটা বাচ্চা দিল। নিজের ক্ষমতা জাহির করবার জন্যেই মতির মা ঐ বাচ্চা ক'টিকেও আগের ভঙ্গিতে ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে মারল। আমরা এইবার তাকে আর কিছু বললাম না। আর আশ্চর্য, মা-বিড়ালটাও আগের মত হৈ-চৈ, দৌড়-ঝাপ করল না। সে হয়ত ইতিমধ্যেই কন্ডিশন্ড হয়ে গেছে। ধরেই নিয়েছে, একেকবার বাচ্চা হবে এবং মতির মা ঝাড়ু দিয়ে সেগুলিকে পিটিয়ে মারবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা সে গ্রহণ করেছে শান্ত ভঙ্গিতে।

আমরা মানুষরাও কি তাই করি না?

মেজোখালার উত্তর শাহজাহানপুরের বাসায় পা দিয়ে এই জাতীয় কিছু ফিলসফিক চিন্তা মাথায় এল। এই বাড়িটির সঙ্গে আমার মেজোখালুর অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। এই বাড়ির প্রতিটি ইটে তাঁর মমতা মাখা। অথচ বেচারা এই বাড়িতে উঠবার দু'দিন আগে মরে গেলেন। প্রকৃতির কি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা! অথচ ফরিদা খালাকে দেখে মনে হল প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতাকে তিনি শান্ত ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। হাসি-খুশি মুখে বাগানে কি যেন একটা চারা লাগাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনাদের নতুন বাড়ি দেখতে এলাম খালা।

খালা আনন্দিত স্বরে বললেন, আয় আয়।

'বাড়ি কোথায় খালা, এতো দেখি রাজপ্রাসাদ। হুলস্থূল কারবার।'

আনন্দে খালার মুখ আরো উজ্জ্বল হল। তিনি প্রায় কিশোরীদের গলায় বললেন, বাইরে থেকে বড় দেখায়, আসলে অত বড় না। রুমগুলি ছোট ছোট।

'তাই নাকি?'

'শুধু মাস্টার বেডরুমটা বেশ বড়। অন্যগুলি ছোট।'

'রুম সব মিলে ক'টা?'

খালা হড়বড় করে রুমের সংখ্যা, বাথরুমের সংখ্যা, স্টোর রুমের আয়তনের কথা বলতে লাগলেন। আমি এমন ভঙ্গি করলাম যে গভীর আগ্রহে শুনছি। শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। নিজের আগ্রহটা বোঝাবার জন্যে দু'-একটা টুকটাক প্রশ্ন করতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে হচ্ছে।

'বুঝলি টুকু, স্টোর রুমটাকে অনায়াসে একটা ঘর করা যায়। বড় জানালা আছে, সিলিং ফ্যান লাগাবার ব্যবস্থা আছে। ভাবছি ঐটাকে একটা ঘর করব।'

'কিন্তু আপনার তো একটা স্টোর রুম দরকার।'

'কোনই দরকার নেই। রান্নাঘরে বিলট-ইন তাক আছে। রাজ্যের জিনিস সেখানে রাখা যায়।'

'তাহলে তো চমৎকার।'

'ভাল আর্কিটেক্ট দিয়ে বাড়ি করবার এই হচ্ছে সুবিধা। নব্বই হাজার টাকা

নিয়েছে আর্কিটেক্ট। তখন সবাই বলেছে, এত টাকা আর্কিটেক্টকে দেয়ার দরকার কি? তারা যা করবে তা তো জানাই আছে। থোর বড়ি খাড়া খাড় বড়ি থোড়। আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখলাম আর্কিটেক্টের দরকার আছে।'

'তবে যে বললেন রুমগুলি ছোট ছোট হয়েছে।'

'মর্ডান আর্কিটেক্ট রুম ছোট ছোট হয়। বড় রুম দিয়ে তুই করবি কি? ফুটবল খেলার জন্যে তো রুম না।'

'তা তো বটেই।'

'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুই এসেছিস খুব ভাল হয়েছে। তোদের বাড়ির কি সব উড়ো খবর পাচ্ছি। সত্য-মিথ্যা তাও জানি না। টেলিফোন করে যে খোঁজ নেব সেই উপায়ও নাই। টেলিফোন কানেকশন এখনো দেয়নি। সপ্তাহ খানিকের মধ্যে নাকি দেবে। ওদের বিশ্বাস নেই। শেষ পর্যন্ত টাকাই খাওয়াতে হবে। তুই ভেতরে গিয়ে বোস, আমি চারা ক'টা লাগিয়ে আসছি।'

'রিমি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। ওর শরীরটা ভাল না। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, ডাক্তার এখনো আসেনি। একা ক'দিক সামলাব?'

রিমি হলুদ রঙের একটা চাদর জড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটের উপর বসেছিল। তার কোলের উপর একটা বই। গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও তার মাথার উপর ফুলস্পীডে ফ্যান ঘুরছে। রিমিকে দেখে একটু মন খারাপ হল। যে কোন সুন্দর জিনিসের মধ্যে মন-খারাপের একটা উপাদান থাকে। রিমিকে যখনই দেখি তখনি মনে হয় আগের বার যে রকম দেখেছিলাম, তারচে' সে আরো সুন্দর হয়েছে। আজ তার শরীর ভাল না। চোখের নিচে কালি পড়েছে। অথচ কি আশ্চর্য, চোখের এই কালিও মানিয়ে গেছে।

রিমি বয়সে আমার মাস তিনেকের বড়। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে খানিক জটিলতা আছে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা না হলে সে আমাকে চিঠি লিখবে। সেইসব চিঠিকে সরল বাংলায় প্রেমপত্র বলা ছাড়া উপায় নেই। চিঠি পড়লে মনে হবে, আমাকে না দেখার কষ্টে সে মরে গেছে। কিন্তু সেই চিঠি পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলে সে কেন জানি বিরক্ত হয়। আমি একবার তার আবেগপূর্ণ চিঠির জবাবে কিছু গাঢ় কথা লিখে ফেলেছিলাম, সে দারুণ রাগ করেছিল। টেলিফোন করে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এইসব তুই কি লিখেছিস? ছিঃ! তুই ছোটভাই, ছোটভাইয়ের মত থাকবি। এসব কি! তুই কি আমার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলতে চাস? রাগে আমার গা-টা জ্বলে যাচ্ছে।

বলেই সে টেলিফোন খট্ করে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন। এবারে গলা আগের চেয়েও চড়া — "টুকু শোন্, আমাদের বাড়িতে আর আসবি না।

তোর মনের মধ্যে পাপ আছে। খবরদার, তুই কিন্তু আসবি না।"

আমি ঐ বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। একমাসের মাথায় রিমির চিঠি এসে উপস্থিত। আবেগে টুইটম্বুর চিঠি।

আজ যে এই বাড়িতে এসেছি সেও চিঠি পেয়ে। তাও এমন চিঠি, যেই পড়বে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

রিমি আমাকে দেখে কোল থেকে বই নামিয়ে বলল, তুই দেখি বাগানে মা-র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললি।

'হ্যাঁ, বললাম।'

'কি কি কথা হল শুনি।'

'তেমন কিছু না।'

'যেমনই হোক, কথাগুলি আমি শুনতে চাই।'

'বললাম তো, ইম্পর্টেন্ট কোন কথা হয়নি। বাড়ি নিয়ে কথা হল। রুমগুলি ছোট ছোট, এইসব।'

রিমি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বাবার সম্পর্কে মা কি তোর সঙ্গে কোন কথা বলেছে? 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবি। হয়েছে কোন কথা?

'না।'

'বাবা মারা গেলেন পনেরো দিনও হয়নি। আজ হচ্ছে ফোর্টিনথ ডে, অথচ মা বাবার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছে। সারাক্ষণ বাড়ি বাড়ি করছে। ঘর সাজাচ্ছে। বাগান করছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি। তাঁকে দেখে যে-কেউ বলবে — একজন সুখী মহিলা। ওজন পর্যন্ত বেড়েছে। পরশু রাতে বাথরুমে গুন গুন করে গান গাইছিল।'

'কষ্টের একটা ব্যাপার সারাক্ষণ মনে রেখে লাভ নেই। কেউ রাখেও না। তুইও রাখবি না। কিছুদিন পর দেখা যাবে তুইও দুপুরবেলা শিবরামের বই পড়ে খিলখিল করে হাসছিস।'

'টুকু, আমাকে তুই তুই করে বলবি না। তোর মুখে তুই শুনতে খুব খারাপ লাগে।'

'আচ্ছা বলব না।'

'বোস। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'আমি বসলাম। রিমি তার গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কাছে এগিয়ে এল। গলার স্বর নিচু করে বলল, আনন্দে মা-র মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'আমার তো মনে হয় তোর নিজের মাথাই এলোমেলো।'

'আমার মাথা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। মা'র তা নেই। বাবার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

'ছিনিমিনি খেলছে মানে?'

'রকিব সাহেব বলে এক ভদ্রলোককে দু'লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। উনি ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা করবেন এবং তার আয় থেকে মাকে মাসে মাসে সাত হাজার টাকা দেবেন। ঐ টাকায় আমাদের সংসার চলবে।'

'ব্যবস্থা তো ভালই মনে হচ্ছে।'

'তোর মাথা মোটা, এই জন্যে তোর কাছে ব্যবসা ভাল বলে মনে হচ্ছে। ঐ লোকটা ধুরন্ধর প্রকৃতির।'

'বুঝলি কি করে?'

'আমি বুঝতে পারি। মানুষের চোখের দিকে তাকালেই সেই মানুষটা কেমন আমি বুঝতে পারি। যেমন ধর, তুই — তুই হচ্ছিস বোকা।'

'শুনে ভাল লাগল।'

'শুনে তোর ভাল লাগছে। কারণ তুই বোকাই থাকতে চাস। বোকা থাকার মজা আছে, এইটা তুই টের পেয়ে গেছিস।'

'রকিব সাহেব লোকটা কে?'

'বাবার বন্ধু। আগেও আসত। তখন ড্রয়িং রুমে বসে ভিসিআর দেখতো। এখন সরাসরি মা-র শোবার ঘরে উঁকি দেয়।'

'উঁকি দেয়া এবং ঢুকে যাওয়া তো এক না।'

'এখন উঁকি দিচ্ছে। দু'দিন পরে ঢুকবে।'

রিমি আবার চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে ফেলল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই তো জানিস না আমরা এখন সমস্ত আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা। মা আমার সব চাচাদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন।'

'কারণ কি?'

'মা'র ধারণা, সব চাচাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের টাকাপয়সা হাতানো। মা তা হতে দিতে চান না।'

'তোদের কি অনেক টাকা নাকি?'

'মনে হচ্ছে তাই। অবশ্যি আমি ঠিক জানি না। বাবার তিনটা ইন্সুরেন্স ছিল। সেখান থেকে টাকা এসেছে। ফিক্সড ডিপোজিট ছিল। ডিফেন্স বন্ড ছিল। সাভারে জমি আছে দু'বিঘা। নিউ এয়ারপোর্টের কাছে দশ কাঠা জমি কেনা হয়েছে। মগবাজারে একটা ফ্ল্যাট কেনা আছে। চারতলায় ফ্ল্যাট।'

'বলিস কি!'

'বাবা অসৎ লোক ছিলেন তা জানতাম কিন্তু এতটা অসৎ ছিলেন তা জানতাম না। যতই জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তির খবর পাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি।'

'অসৎ মানুষের ছেলেমেয়েদের জীবন মোটামুটি সুখেরই হয়। তাদের টাকাপয়সার অভাব থাকে না। তোর জীবনটা সুখেই কাটবে।'

রিমি ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, শুয়ে থাক, তোর বোধহয় জ্বর বাড়ছে।

রিমি ক্লান্ত গলায় বলল, দিন দিন তোর চেহারা এতো খারাপ হচ্ছে কেন?

'খারাপ হচ্ছে নাকি?'

'কেন, আয়নায় নিজেকে দেখিস না? তোকে দেখাচ্ছে বাসের কন্ডাকটরদের মত। আচ্ছা, তুই এখন যা, তোর সঙ্গে কথা বলতে এখন আর ভাল লাগছে না।'

মেজো খালার বাগানের কাজ শেষ হয়েছে। তিনি ঝরণার পানিতে হাত ধুচ্ছেন। আমাকে বেরুতে দেখে অপ্রসন্ন গলায় বললেন, কথা হয়েছে রিমির সঙ্গে?

'হুঁ।'

'ও কি বলল?'

'তেমন কিছু না।'

'আহ শুনি না কি বলল। আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে?'

'না।'

'আমার শত পুরুষের ভাগ্যি। ও তো আমাকে এখন দু'চোখে দেখতে পারে না। এমন সব কথা বলে যে ইচ্ছে করে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যাই। আমি নাকি তার বাপের সম্পত্তি নয়-ছয় করছি। ওর আছে কি যে আমি নয়-ছয় করব? একটা দারোয়ান রেখেছি, একটা মালী রেখেছি। অনুচিত হয়েছে? তুই বল?'

'না। অনুচিত হয়নি।'

'রিমির ধারণা, দারোয়ান মালী এসব আমাদের দরকার নেই। আমরা দু'জন মোটে মেয়েমানুষ, একা একা থাকি। দারোয়ান মালী ছাড়া চলবে কিভাবে!'

'তা তো বটেই।'

'এসব কথা থাক। তোর কাছে তোদের কথা শুনি।'

'কি শুনতে চান?'

'তোদের বাড়িতে হচ্ছেটা কি?'

'কিসের কি হচ্ছে?'

'ন্যাকা সাজবি না। তোর ন্যাকা ভাবটা অসহ্য। তোর ছোটচাচা নাকি কোন নার্সকে বিয়ে করে ফেলেছে?'

'এ রকম অবশ্যি শোনা যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যা জানি না।'

'আমি তো শুনলাম ঐ হারামজাদীকে বাড়িতে নিয়ে তুলেছে। তোর ছোটচাচী ঘুমের ওষুধ খেয়ে মর মর।'

'সে রকম কিছু না তো!'

'বলিস কি!'

'যা শুনছ সবই গুজব। বাসায় বলতে গেলে কিছুই হয়নি। খুবই শান্ত পরিস্থিতি। এত শান্ত যে মনে হচ্ছে ছোটচাচা সম্পর্কে যা শুনছি, তাও গুজব।'

মেজোখালা এমনভাবে তাকালেন যেন বুঝতে চেষ্টা করছেন আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি। আমার মুখ দেখে তা বোঝা বেশ শক্ত। আমি মিথ্যা কথা বলার সময় খুব স্বাভাবিক থাকি। অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ মানুষও দ্বিধায় পড়ে যায়। মেজোখালা যেমন দ্বিধায় পড়ে গেছেন।

'যাই খালা।'

'চা-টা কিছু খেয়ে যা।'

'আজ একটা জরুরি কাজ আছে। অন্যদিন এসে চা খেয়ে যাব।'

'তোদের বাসায় তাহলে কোন ঝামেলা নেই?'

'উহুঁ।'

বাসায় ঝামেলা নেই কথাটা একশ'ভাগ মিথ্যা। অসম্ভব ঝামেলা চলছে। ছোটচাচী সত্যি সত্যি ঘুমের ওষুধ খেয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড করেছে। ছোটচাচীর বাবা রিটায়ার্ড জাজ সাহেব বলেছেন তিনি দেখে নেবেন। আমার বড় চাচা ঘন ঘন মিটিং করছেন। ছোটচাচাকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। বড়চাচীকে আমেরিকায় টেলিফোন করা হয়েছে। শুক্রবারে তাঁর আসার কথা।

ছোটচাচা ক'দিন ধরেই চেম্বারে যাচ্ছেন না। বেশির ভাগ সময় দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। এই ক'দিন দাড়ি-গোঁফ না কামানোয় সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কুৎসিত একটা অবস্থা। এদিকে বাবা আবার বিছানায় পড়ে গেছেন। দিনে কুড়িবার করে তাঁকে বাথরুমে যেতে হচ্ছে। কয়েক গ্যালন স্যালাইন ওয়াটার খেয়ে তাঁর কিছু হচ্ছে না।

এতসব ঝামেলার মধ্যে কমলা আবার ছাদে ভূত দেখে দাঁত কপাটি লেগে পড়ে গেল। ভূতটা নাকি শূন্যে হাঁটছিল। কমলাকে দেখেই লম্বা কাল হাত বাড়িয়ে বলল, এই কমলা, তোকে ছুঁয়ে দিলাম।

কমলার এই ভূতের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না, তবে সবাই ভয়ে আধমরা। মীরা-ইরা সামান্য শব্দেই চেঁচিয়ে উঠছে। মা'কে ঘুমুতে হচ্ছে মীরা-ইরার সঙ্গে। অথচ তাঁর খুব ইচ্ছা তিনি অসুস্থ বাবার সঙ্গে থাকেন। তা সম্ভব হচ্ছে না।

গতকাল রাতে আমাকে এসে বললেন, ও টুকু, তুই তোর বাবার সঙ্গে ঘুমুবি?

আমি হেসে ফেললাম।

মা দুঃখিত গলায় বললেন, হাসছিস কেন? হাসির কথা বলেছি?

'হুঁ বলেছ।'

'বাবার সাথে ছেলেরা ঘুমায় না?'

'দশ বছরের নিচের ছেলেরা হয়ত ঘুমায়। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলেরা ঘুমায় না।'

'ঘুমুলে অসুবিধা কি?'

'ঘুমুলে দু'জনেরই ক্ষতি হয়। দু'জনেরই অহংবোধে আঘাত লাগে। ব্যক্তিত্বের

সংঘাত শুরু হয়। শুরুটা চেইন রিএ্যাকশনের মত। একবার শুরু হলে অতি দ্রুত এক্সপ্লোসিভ লিমিটে পৌছে যায়। তুমি বুঝবে না।'

মা চুপ করে গেলেন।

কিছু কঠিন কঠিন শব্দ এদিক–ওদিক করে বললেই মা চুপ করে যান। ক্ষীণ স্বরে মাঝে মাঝে বলেন, কথা বলার সময় তো বড় বড় কথা, এদিকে পরীক্ষায় তো গোল্লা খাস।

আজ সে রকম কিছু বললেন না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

৪

ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল।

ছোটচাচা এক দুপুরে বাসায় এসে মীরাকে বললেন, মীরা, আমি সমিতাকে আজ বিয়ে করেছি। তুই খবরটা তোর চাচীকে দিয়ে আয়। সমিতা তিনটার দিকে আসবে।

মীরা পানির গ্লাস নিয়ে যাচ্ছিল। অবিকল সিনেমার দৃশ্যের মত এই কথা শুনে তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে গেল।

ছোটচাচা ইংরেজিতে বললেন, আমাদের একটাই মাত্র জীবন। এই এক জীবনে আমাদের অধিকাংশ সাধই অপূর্ণ থাকে। আমি তা হতে দিতে চাই না। যা পাই হাত পেতে নেব। তুই তোর চাচীকে এই খবরটা দিয়ে আয়। যাবার আগে ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরাগুলি ফেলে দিয়ে যা। পা কাটবে।

মীরা তার কিছুই করল না। দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল। তার কিছুক্ষণ পরই কমলা ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরায় তার পা কেটে রক্তারক্তি করল।

এইসব খবর আমি অবশ্যি জানলাম অনেক পরে। ঐদিন কি মনে করে যেন ক্লাশ করতে গিয়েছিলাম। এ. কে. বদরুদ্দোজা নামের নতুন একজন স্যার 'আইনের ভাষ্য' বলে খানিকক্ষণ বিজ বিজ করে কিছু বলতেই হৈ–চৈ বেঁধে গেল। পেছনের একজন উঁচু গলায় বলল — আইন, গাইন। সারা ক্লাশ জুড়ে হাসি। হাসি থামতেই ক্লাশের শেষ প্রান্ত থেকে অন্য আরেকজন বলল — আইন গাইন, ফে, কাফ, কাফ। নতুন স্যার পুরোপুরি হতভম্ভ। এই অবস্থা তিনি কল্পনাও করেন নি। স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন — ইউ, ইউ, উঠে দাঁড়াও। কি শুরু করেছ?

আমি উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু কিছুই বললাম না। ভদ্রলোক যে পরিমাণ রেগে আছেন তাঁকে কিছু বলতে যাওয়া অর্থহীন।

'কেন তুমি আইন, গাইন করছ? কেন?'

আমার পেছন থেকে একজন বলল, স্যার, ও মাদ্রাসা থেকে পাশ করেছে।

আবার চারদিকে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। গম্ভীর স্বরে অন্য একজন খুব দরদ দিয়ে শুরু করল, আইন গাইন ফে কাফ কাফ। আলিফ জবর আ, বে জবর বা . . .

ক্লাশ ডিসমিস হয়ে গেল। নতুন স্যার আমাকে বললেন, তুমি আস আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে বের হয়ে এলাম। ক্লাশ থেকে বের হওয়া মাত্র তিনি বললেন — তোমাকে পঁচিশ টাকা ফাইন করা হল। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

'চল আমার সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ইউ র‍্যাসকেল। কত ধানে কত চাল তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমি আবারো বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল স্যারের ঘরে আমাকে ঘণ্টা খানিক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন আমি নিরীহ টাইপ কেউ, না-কি কোন ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যখন নিঃসন্দেহ হলেন আমি নিরীহ ধরনের একজন, তখন বললেন, তোমাকে আমি এক্সপেল করছি। কেনসার সেল আমি রাখব না। আমি আবারো বিনীত গলায় বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

স্যারের কাছে আমার নাম রোল নাম্বার লিখে দিয়ে বাসায় এসে দেখি বিরাট নাটক। ছোটচাচা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। বিয়ে হয়ে গেছে। একটা স্যুটকেস হাতে সমিতা উঠে এসেছে বাড়িতে। তার সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে। এই মেয়েটি তার আগের পক্ষের স্বামীর। যে স্বামী আট বছর আগে মারা গেছেন।

নাটকের মূল অংশটি হচ্ছে ভেতরের বাড়িতে। বসার ঘরে দু'টি স্যুটকেসের পাশে ছোট মেয়েটি বসে আছে। আমি খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা গেল না।

ছোটচাচী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। দরজা খুলছেন না। মীরা-ইরা দুজনেই বন্ধ দরজার সামনে কান্নাকাটি করছে এবং বারবার বলছে — দরজা খুলুন চাচী, দরজা খুলুন। প্লীজ, প্লীজ।

দ্বিতীয় মিটিং চলছে ছোটচাচা এবং বড়চাচার মধ্যে। সেখানেও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে।

সমিতা বসে আছে খাবার ঘরের টেবিলে। মা ঠিক তার মুখোমুখি। এই দু'জন কোন কথা বলছেন না। মা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টিতে রাগ বা ঘৃণা খুব নেই, আছে বিস্ময়।

আমি বসার ঘরে বাচ্চা মেয়েটির কাছে চলে এলাম। নরম গলায় বললাম, কেমন আছ খুকী?

সে ঠিক বড়দের মত আবেগহীন গলায় বলল, ভাল।

'নাম কি তোমার?'

'মিস লরেটা গোমেজ।'

'মিস?'

'হ্যাঁ। বিয়ে হয়নি তো, তাই মিস।'

বাচ্চা মেয়েটির কথায় চমৎকৃত হলাম। বাচ্চারা বড়দের সহজেই চমকে দিতে

পারে। বড়রা তা পারে না। বড়দের কাণ্ডকারখানায় শিশুরা চমকায় না। আমার মনে হল, এই মেয়ে তার মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ এবং এই বাড়িতে উঠে আসার পুরো ব্যাপারটাই বেশ সহজে মেনে নিয়েছে।

'খুকী, তুমি কি এই বাড়িতেই থাকবে?'

'তা ছাড়া কোথায় থাকবো?'

'কোন ক্লাশে পড় তুমি?'

'ক্লাশ থ্রী।'

'বাহ্, তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, তুমি থ্রীতে পড়। মনে হয় ওয়ান কিংবা টু।'

মিস লরেটা গোমেজ গম্ভীর গলায় বলল, জানেন, আমি কিন্তু সব ক্লাশে ফার্স্ট হই।

'চমৎকার!'

'বিড়ালের বাচ্চার ইংরেজি কি আপনি বলতে পারেন?'

'মানুষের বাচ্চার ইংরেজিই জানি না আবার বিড়ালের বাচ্চা! তুমি জান না-কি?'

'জানি। কিটেন।'

'হাতির বাচ্চার ইংরেজি কি তুমি কি জান?'

মেয়েটা অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে থেকে বলল, হাতির বাচ্চার কোন ইংরেজি হয় না।

গভীর মমতায় আমার চোখ ছল ছল করতে লাগল। এই বাড়িতে কত-না দুঃসময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। বড়দের তৈরি করা নাটকে তার অভিনয় করতে হবে। ইচ্ছা না থাকলেও করতে হবে।

'মিস লরেটা গোমেজ, আমি তোমার সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্প করি?'

'আপনার ইচ্ছা করলে করতে পারেন।'

আমি তার মুখোমুখি বসলাম। এই প্রথম কাল রোগা বড় বড় চোখের মেয়েটি হাসল। তার হাসির একটাই মানে — আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম।

সে পা নাচাতে নাচাতে বলল, আচ্ছা বলুন তো, দু'টো স্যুটকেসের মধ্যে কোনটা আমার?

'সবচে' বড়টা।'

সে চমকে উঠে বলল, ঠিক বলেছেন। কি করে বললেন?

আমি সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, এক কাজ করলে কেমন হয় লরেটা, বাসায় এখন ঝগড়া চলতে থাকবে। বড়দের ঝগড়া করার সুযোগ দিয়ে আমরা দু'জন চল আইসক্রীম খেয়ে আসি।

'চলুন।'

'তুমি কি তোমার মা'কে বলে যাবে?'

'না।'

সে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল।

বাড়িতে হৈ-চৈ চলতেই থাকল।

ছোটচাচীর বাবা গোলাপ-প্রেমিক জাজ সাহেব রাত ন'টার দিকে চলে এলেন। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। তিনি বসার ঘরে বসে ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে লাগলেন। কোত্থেকে সেই সন্ন্যাসী ব্যাটাও জুটেছে। সে গভীর আগ্রহে এই অগ্নিকাণ্ড দেখছে। অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েও ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না, কারণ, দেখার কেউ নেই। শুধু আমি এবং সন্ন্যাসী বসে, আর কেউ নেই।

সন্ন্যাসী এর মধ্যে এক কাণ্ড করল — জাজ সাহেবকে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছে দেয়াশলাই থাকলে একটা কাঠি দিন। কান চুলকাব।

'হু আর ইউ?'

'আমি স্যার কেউ না, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী।'

'এইখানে কি চান?'

'বললাম না, আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, কারো কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। আপনি স্যার এইভাবে চিৎকার করবেন না। এরকম রাগারাগিতে অনেক সময় হার্ট এ্যাটাক হয়।'

'সাট আপ।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। আপনার কাছে তাহলে দেয়াশলাই নেই?'

'সাট আপ।'

অতি উত্তপ্ত আবহাওয়া রাত এগারটার দিকে হঠাৎ করে খানিকটা পড়ে গেল। বড়চাচা এসে জাজ সাহেবকে কি যেন বললেন, তিনি বাড়ি চলে গেলেন। ছোটচাচী ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল না খুব আপসেট।

আমার কাছে একমাত্র বাবাকেই অসম্ভব আপসেট মনে হল। তিনি, মনে হল, কান্নাকাটিও করছেন, তাঁর চোখ লাল। আমাকে এসে বললেন, কেউ তো সারাদিন কিছু খায়নি। টুকু, তুই কোন হোটেল থেকে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আয়।

'এত রাতে কিছু পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। পাওয়া গেলেও কেউ কিছু খাবে বলে মনে হয় না। খিদে লাগলে পাউরুটি-বিসকিট আছে, ঐ খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

'আচ্ছা তাহলে থাক।'

আমি সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখি পাঁচটা সিগারেট। ঠিক করলাম, আজকের এই বিশেষ রাতটা মনে রাখবার জন্য পর পর পাঁচটা সিগারেট খাব। মাথা যখন ঝিম ঝিম করতে থাকবে তখন বিছানায় শুয়ে পড়ব।

সবে দু'টা সিগারেট শেষ করেছি, ছোটচাচা লরেটাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, এই মেয়েটাকে শোয়াবার জায়গা পাচ্ছি না। তোর কাছে রাখবি?

'রাখব।'

'এক্সট্রা বালিশ আছে তোর ঘরে?'

লরেটা বলল, আমার বালিশ লাগবে না।

আমি মেয়েটাকে আমার পাশে শুইয়ে দিলাম। এত রাত হয়েছে তবু তার চোখে ঘুম নেই। সে চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে। এক সময় বলল, আমি আপনাকে কি ডাকব?

'টুকু ডাকবে। আমার নাম টুকু।'

'বড়দের বুঝি নাম ধরে ডাকা যায়?'

'বড় হলেও আমি তোমার বন্ধু। বন্ধুকে নাম ধরে ডাকা যায়। নিয়ম আছে।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, টুকু, তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। ঘুম আসছে না।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাতি নিভিয়ে দিলাম। এই শিশুটির চোখের জল আমি দেখতে চাই না।

পরদিন ভোরে ছোটচাচী জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা উকিল নোটিশ চলে এল। সেই নোটিশে কি লেখা আমরা জানলাম না, কারণ, উকিল নোটিশ ছোটচাচা কাউকে পড়তে দিলেন না।

রাতে বড়চাচা আমেরিকায় টেলিফোন করলেন। টেলিফোনে বড়চাচীকে বলা হল তিনি যেন এক্ষুণি চলে আসেন। জানা গেল চাচী আসছেন। বড়চাচা এমন ভঙ্গি করতে লাগলেন যেন চাচী আসামাত্র সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অথচ বড়চাচী কখনো কোন সম্যসার সমাধান করতে পারেননি। বরং তাঁর দীর্ঘ জীবনে নানান সমস্যা তৈরি করেছেন। এই যে দিনের পর দিন বাইরে পড়ে আছেন এ-ও কি এক সমস্যা নয়?

বিদেশের জলবায়ুতে মেদ বৃদ্ধির কোন উপাদান আছে। বড়চাচী যতবার বিদেশ থেকে আসেন ততবারই দশ থেকে বারো কেজি বাড়তি মেদ নিয়ে আসেন।

এবার একেবারে গোলআলু হয়ে ফিরলেন। রঙ আগের চেয়ে অনেক ফর্সা, মাথার চুল কুচকুচে কাল। চুলের রঙে কলপের একটা অবদান বোঝা যাচ্ছে, তবে গায়ের রঙের রহস্যটা কি, কে জানে।

আমাকে দেখে খুশি-খুশি গলায় বললেন, আর লোকজন কোথায়? আর কেউ এয়ারপোর্টে আসেনি?

আমি বললাম, না।

বড়চাচী অবাক হয়ে বললেন, সে কি! তোর বড়চাচাও আসে নি?

'না।'

'এর মানেটা কি? এত দিন পর আসছি আর এয়ারপোর্টে কেউ নেই! আমি কি ফেলনা?'

'ফেলনা হবেন কেন? আপনার লাগেজপত্র কি এই, না আরো আছে?'

বড়চাচী লাগেজের খোঁজে গেলেন। তিনি নাকি মিডিয়াম সাইজের একটা স্যুটকেস না নিয়েই চলে এসেছেন। কাস্টমস্-এর লোকজনদের সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া শুরু করলেন। তারা বড়চাচীকে আবার ভিতরে ঢুকতে দেবে না, বড়চাচীও ঢুকবেনই। আমি শুনছি তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, কোন্ আইনে আছে যে একবার বেরিয়ে পড়লে আবার ঢোকা যাবে না? দেখুন, আমাকে রুলস শেখাবেন না। এইসব আমার জানা আছে

আমি চমৎকৃত হলাম। কারণ বড়চাচী যে সব জিনিস চমৎকার জানেন, তা হচ্ছে — কি করে লাউ ফুলের বড়া বানাতে হয়, সাজনা গাছের কচিপাতার তরকারি কি করে রাঁধতে হয়, কৈ মাছের পাতুরিতে পেঁয়াজ কাটা দিতে হয় কি দিতে হয় না, তিনি যে কাস্টমস্-এর আইন-কানুনও জানেন, তা জানা ছিল না।

টার্মিনাল থেকে বের হয়ে বললেন, গাড়ি কোথায়? আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, গাড়ি নেই। চলুন বেবিট্যাক্সি নিয়ে নেই। চাচী থমথমে গলায় বললেন, গাড়িও পাঠাল না! এর মানে কি বল্ তো? এর মানেটা কি?

'বাড়িতে নানা ঝামেলা।'

'ঝামেলার কথা কি আমি জানি না? ঠিকই জানি। আধঘণ্টার জন্যে এলে বাড়ি ধ্বংস হয়ে যেত? বল তুই, কি হত আধঘণ্টার জন্যে এলে?'

আমি তাঁকে খুশি করবার জন্যে একটা বিকল্প ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললাম। চাচী মুখ কালো করে ট্যাক্সিতে উঠলেন। আমাকে বললেন, তুই ড্রাইভারের সঙ্গে গিয়ে বোস। তোর গা দিয়ে সিগারেটের গন্ধ বেরুচ্ছে। অন্য কেউ হলে এ কথায় অপমানিতবোধ করত, আমি করলাম না। বড়চাচী এ ধরনের কথা সব সময় বলেন।

'তুই এখন করছিস কি?'

'কিছু না, ল' পড়ছি।'

ল' একটা পড়ার জিনিস হল? খামকা এটা পড়ছিস কেন? তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কোন কালে হল না। দাড়িও তো দেখি ঠিকমত শেভ হয়নি। খোঁচা খোঁচা বের হয়ে আছে।

আমি মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। চাচী খুব যন্ত্রণা করেন। সারাক্ষণ কথা বলেন। এমন সব কথা যা হজম করা বেশ কঠিন। তাঁর মেয়েরা এবং মেয়ের জামাইরা

তাকে কি করে সহ্য করেন কে জানে।

'ও টুকু।'

'জ্বি।'

'তোর জন্যে একটা বাইনোকুলার পছন্দ করেছিলাম। ষাট ডলার দাম। প্যাকেট করে কাউন্টারে গিয়ে দেখি বাইনোকুলারটার কাঁচে ফাংগাস। আর কেনা হল না।'

'বাইনোকুলার দিয়ে আমি কি করব? না কিনে ভালই করেছেন। ঐ সবের আমার দরকার নেই।'

'দরকার থাকবে না কেন? ক্রিকেট খেলাটেলা হলে দুর থেকে দেখবি। পরের বার আসবার সময় নিয়ে আসব, তখন দেখবি কত চমৎকার।'

'আচ্ছা নিয়ে আসবেন।'

'মীরা আর ইরার জন্যে দু'সেট কসমেটিকস্ কিনেছিলাম 'এভন' কোম্পানীর। তাড়াহুড়ার মধ্যে ছোট মেয়ের বাসায় ফেলে এসেছি। এখন এমন খারাপ লাগছে! মেয়েগুলির জন্যে কখনো কিছু আনা হয় না। আশা করে থাকে।'

এসব হচ্ছে তাঁর কথার কথা। আমেরিকা থেকে আসার পর প্রথম কিছুদিন যার সঙ্গেই দেখা হবে, তাকেই তিনি এরকম কিছু বলবেন। তাঁর এই স্বভাব নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করা হয়। তিনি তা বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব ম্যানেজ করতে পারেন।

'ও টুকু।'

'জ্বি।'

'বাড়ির অবস্থা কি বল্।'

'গেলেই দেখবেন।'

'সে তো দেখবই। বলতে অসুবিধা আছে? তোর ছোটচাচা কি মেয়েটাকে বাড়িতে এনে তুলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বলিস কি!'

'ছোটচাচী অর্থাৎ এক্স ছোটচাচী কোর্টে কেইস করে দিয়েছেন, মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন, সম্মানহানী এইসব কি যেন। ভাল ভাল উকিলও দেওয়া হয়েছে। আমাদের অবস্থা কেরোসিন বলতে পারেন। ক্রমাগত কোর্টে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।'

চাচী এতবড় খবর শোনার পরও কোন শব্দ করলেন না। পেছনে ফিরে দেখি, তিনি সীটে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরালাম। গাড়ি বড় বড় কয়েকটা ঝাঁকুনি খেল। চাচীর ঘুমের তাতে উনিশ-বিশ হল না। মোটা মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগে না। শরীরের মত এদের ঘুমও ভারী হয়।

বড়চাচীকে নিয়ে আমি পৌঁছলাম খুব খারাপ সময়ে। ঐ সন্ন্যাসী ব্যাটা ভোলাবাবু তখনই কি জন্যে যেন এসেছে, বড়চাচা গলা ফুলিয়ে তাকিয়ে তাকে

ধমকাচ্ছেন। সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসীসূলভ নির্লিপ্ততায় ঐসব ধমক হাসিমুখে সহ্য করছে। বড়চাচা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলছেন, ইউ আর এ ফ্রড নাম্বার ওয়ান। এ থিফ। খবর্দার, এখানে আর অসবি না।

সন্ন্যাসী বলছে, রাগারাগি করাটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে মঙ্গলজনক হবে না। তাছাড়া তুই-তোকারি ভাল শুনাচ্ছে না, সবার মুখে তো সবকিছু মানায় না।

'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।'

'যাচ্ছি, আপনি দয়া করে এত উত্তেজিত হবেন না।'

'আবার কথা বলে!'

'আপনি বলেন বলেই বলি। আপনি না বললে বলতাম না। ধ্বনি হলেই প্রতিধ্বনি হয়।'

'খবর্দার ব্যাটা, বড় বড় কথা বলবি না। বড় বড় কথা তোরচে' আমি বেশি বলতে পারি।'

'সে তো খুবই আনন্দের কথা। আপনি বলুন, আমি শুনি।'

'তোকে ধরে একটা আছাড় দেব ব্যাটা ফ্রড।'

আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আমার ওজন অনেক।'

'চুপ! চুপ!'

'আপনি চুপ করলেই আমি চুপ করব। আমি আগেই বলেছি ধ্বনি হলেই প্রতিধ্বনি হবে।'

'চুপ! চুপ!'

কথোপকথনের পুরো অংশটি আমরা বসার ঘরে ঢোকার আগে আগে শুনলাম, চাচী হতভম্ভ গলায় বললেন, তোর চাচা কার সঙ্গে এরকম চেঁচামেচি করছে? লোকটা কে?

লোকটা একজন সন্ন্যাসী — নাম ভোলাবাবু।'

তোর চাচা সন্ন্যাসী নিয়ে কি করছে? হচ্ছে কি এসব? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

চাচী চোখে-মুখে হতভম্ভ ভাব নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন এবং বড়চাচাকে বললেন, এই, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

বড়চাচা গলা আরো চড়িয়ে বললেন, তুমি ভিতরে যাও। চাচী আরো হকচকিয়ে গেলেন। তিনি আহত গলায় বললেন, তুমি ঝগড়া করছ কেন?

চাচা থমথমে গলায় বললেন, ভূত দেখাবার নাম করে ব্যাটা সারারাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। এখন বড় বড় কথা বলে। আমি এত সহজে ছাড়ার লোক না। স্ক্রু কীভাবে টাইট দিতে হয়, আমি জানি। আমাকে ব্লাফ দেয়, কত বড় সাহস!

চাচী বললেন, ভূত দেখাবার কথা তুমি কি বলছ? ভূত দেখা মানে? ভূত দেখা যায় না-কি?

'কি মুশকিল! ভেতরে যেতে বললাম না? কানে শুনতে পাও না?'

চাচী আহত এবং অপমানিত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অন্যবারের মত এবার আর তাঁকে দেখে কেউ ছুটে এল না। মীরা-ইরা এসে জড়িয়ে ধরল না। চাচী বললেন, বাসায় কেউ নাই নাকি?

'আমি বললাম, থাকার তো কথা। সবাই বোধহয় দোতলায় আছে। চলুন দোতলায় চলে যাই।'

'আমি এখন সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। তুই সবাইকে ডেকে আন। আর তোর বড়চাচাকেও আসতে বল . . . ।' চাচীর কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ি দিয়ে সমিতাকে নামতে দেখা গেল। তার পিছু পিছু নামলেন ছোটচাচা। তিনি সিঁড়ি থেকে বললেন, ভাবী, ভালো আছেন? খুব একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, পরে আপনার সাথে কথা বলব।

চাচী অবাক হয়ে সমিতার দিকে তাকিয়ে আছেন। তারা চলে যাবার পর তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, এই কি সেই মেয়ে?

'হ্যাঁ।'

'ক'দিন হল এ বাড়িতে আছে?'

'দিন সাতেক।'

'লজ্জা-শরম দেখি মেয়েটার একেবারেই নেই। এই বাড়িতে এসে উঠল?'

'স্বামীর বাড়িতে উঠতে অসুবিধা কি? স্বামীর বাড়িতে উঠতে লজ্জা নেই।'

'স্বামীর বাড়ি? স্বামীর বাড়ি মানে? বিয়ে হয়েছে নাকি? বিয়ের কথা তো কেউ কিছু লিখেনি।'

'অনেক কিছুই কেউ আপনাকে জানায় নি। এখন জানবেন।'

আমি দোতলায় লোকজনের খোঁজে গেলাম। কাউকে পেলাম না। মীরা গেছে তার কোন ক্লাশ ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নোট আনতে। ইরা গেছে তার সঙ্গে। বড়চাচীর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, সবাই জানে আজ আমি আসছি। তারপরেও কেউ বাসায় নেই! এ বাড়িতে হচ্ছে কি? আমি সহজ স্বরে বললাম, অনেক দিন আপনি এ বাড়িতে থাকেন না, কাজেই এ বাড়ির নিয়ম-কানুন এখন কি তা জানেন না। জানলে এত অবাক হতেন না। হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি চা দিতে বলি।

আগে তুই তোর বড়চাচাকে ডেকে আন। এক্ষুণি আন। বলবি খুব জরুরি।

তাঁকে পাওয়া গেল না। জানা গেল সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে বের হয়ে গেছেন। এতদিন পর স্ত্রী বাইরে থেকে ফিরেছে অথচ তিনি একটা মুখের কথা বলার জন্যেও ভেতরে আসেন নি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সত্যি সত্যি বড়চাচীর চোখে পানি এসে গেল।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, তোরা সব ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করছিস, তাই না? কি কি করবি সব আগে থেকে ঠিক করা। যুক্তি করে মীরা-ইরা বাইরে চলে গেছে। একটা লোককে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছিস যাতে আমি ঘরে ঢোকামাত্র তোরা একটা ঝগড়া শুরু করতে পারিস। তোর চাচাও আমার সঙ্গে কথা না বলে বের হয়ে গেল। আমি বোকা, তবে এটা না বোঝার মত বোকা আমি নই।

তিনি প্রায় শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। দেশ-বিদেশ ঘুরলেও বাঙালি মেয়েরা ঠিক আধুনিক কখনো হয়ে উঠতে পারে না। কাঁদার সামান্য সুযোগ পেলেও তা গ্রহণ করে। চাচী বাইরের কাপড় না বদলেই উপরে গিয়ে শুয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে অস্ফুট গলায় বলতে লাগলেন, কী হচ্ছে? এ বাড়িতে এসব কি হচ্ছে?

এ বাড়িতে কি যে হচ্ছে, তা তিনি পুরোপুরি জানলেন সন্ধ্যার পর পারিবারিক বৈঠকে। তিনি জানলেন যে, এ বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে ছোটচাচী উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন। কারণ বাড়িটা তাঁর নামে দলিলপত্র করা। তিনি আরো জানলেন যে, টেলিফোনে ছোটচাচাকে নানান ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ছোটচাচীর বাবা জাজ সাহেব কিছু গুণ্ডাপাণ্ডাও লাগিয়েছেন যারা এক দুপুরে ছোটচাচার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়ে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দু'জন শুটকো মত লোক ছোটচাচার চেম্বারে ঢুকে বলে গেছে, এই যে চোখের ডাক্তার, চোখ দুটো গেলে দিলে কেমন লাগবে, বলেন দেখি? একদিন এসে দু'টো চোখ গেলে দিয়ে যাব।

জাজ সাহেবের মত গোলাপ-প্রেমিক লোক এরকম গুণ্ডা লাগাবেন, তা ভাবা যায় না। তবে তিনি যে লাগিয়েছেন তা বোঝা গেল মঙ্গলবার রাত ন'টার দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে। আমি বাড়ির সামনের ফুটপাতে সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, হঠাৎ দেখি রোগা একটা ছেলে মোটর বাইক নিয়ে গেটের কাছে এল। এক পলকের জন্যে থেমে ঝড়ের বেগে বাইক নিয়ে চলে গেল, পর মুহূর্তেই বিকট আওয়াজ। তখনো বুঝতে পারিনি যে, এই মোটর বাইকওয়ালা ছেলেটা একটা বোমা ফাটিয়ে গেছে। এই বোমায় আমাদের কারোর কিছু হল না — ছোটচাচার গাড়ির ড্রাইভার কুদ্দুসের বাঁ পা উড়ে গেল। কুদ্দুস এমন অবস্থায়ও জ্ঞান হারাল না। শীতল গলায় বলল, ভাইজান, আমারে হাসপাতালে নেন। হাসপাতালেও কুদ্দুসের জ্ঞান বজায় রইল। অথচ বড়চাচী সেই যে বোমার শব্দে জ্ঞান হারালেন তা ফিরে পেলেন পরদিন ভোর ছ'টায়। জ্ঞান পাবার পর জানতে পারলেন কুদ্দুস মারা গেছে।

আমরা বড় সমস্যায় পড়ে গেলাম। কুদ্দুসের আত্মীয়স্বজন কারোর কোন ঠিকানা আমরা জানি না। কুদ্দুস একবার বলেছিল, তার দেশ চাঁদপুর। সে প্রতি দু'মাস পর তিন দিনের ছুটিতে চাঁদপুরে যায়, সঙ্গে ছোট ছোট শার্ট-প্যান্ট থাকে। এই শার্ট-প্যান্ট

কি তার ছেলেদের জন্যে? কতবড় তারা — আমরা তার কিছুই জানি না।

কুদ্দুস যে ঘরে থাকতো, সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। একজন মানুষ কোন রকম ঠিকানা না রেখে ঠিকানাবিহীন এক দেশের দিকে রওনা হল।

কুদ্দুসের ডেডবডি নিয়ে আমরা মহা যন্ত্রণায় পড়লাম। সাধরণ মৃত্যুতেই অনেক সমস্যা, অপঘাতে মৃত্যু মানে — অতলান্তিক সমুদ্র। পোস্টমর্টেম হবে, পুলিশী তদন্ত হবে, কেইস ফাইল হবে, পত্রিকার লোকজনও নিশ্চয়ই আসবে। এই জাতীয় মৃত্যুগুলি সম্পর্কে পত্রিকাওয়ালাদের আগ্রহ সীমাহীন। 'হত্যা', 'পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ভেতরকার কথা', 'ঘাতক বোমা, পুলিশ নীরব।'

এই রকম কোন মৃত্যু ঘটা মানে জলের মত টাকা যাওয়া। সাবইকে টাকা খাওয়াতে হয়। পান খাবার জন্যে সবাই কিছু-না-কিছু পাবে। এখন কথা হচ্ছে — কুদ্দুসের জন্য এত ঝামেলা আমরা করব, কি করব না, তবে টাকাওয়ালা মানুষের জন্যে কোন ঝামেলাই ঝামেলা না। আমরা নাসিমুদ্দিন নামে আমাদের দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়কে খবর দিলাম। তিনি অফিস ফেলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন। মুখভর্তি পান। হাসি-হাসি ভাব। যেন এই ঝামেলায় খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

এই জাতীয় চরিত্রের সংখ্যা আমাদের সমাজে প্রচুর। এঁরা হচ্ছেন সমস্যা-বিশারদ। বিস্তর লোকজনকে তাঁরা চেনেন। কার কাছে গেলে কোন্ কাজটা হয়, তা এঁদের নখদর্পণে। পুলিশের লোক, মন্ত্রির পি.এ.-দের সঙ্গেও তাঁদের মাখামাখি থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে এরা পাসপোর্ট বের করতে পারেন। কেউ হয়ত বিদেশ থেকে প্রচুর মালামাল নিয়ে আসছে, তাঁকে খবর দিলে তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কাস্টমসের লোকজন ব্যাগ না খুলেই চক দিয়ে ক্রসচিহ্ন দিয়ে দেবে। হাউস বিল্ডিং-এর লোন কি করে পেতে হয় তাও তাঁরা খুব ভাল করে জানেন।

নাসিমুদ্দিন মামা ঘরে পা দিয়েই বললেন, চিন্তার কিছু দেখছি না। আগে চা নিয়ে আস, চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি — টেলিফোন ঠিক আছে? গোটাদশেক টেলিফোন করতে হবে।

আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর ভয় নেই, এবার ব্যবস্থা হবেই। নাসিমুদ্দিন মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, হাজার তিনেক টাকার ব্যবস্থা করেন, ছোট নোট। এর আত্মীয়-স্বজনের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

বাবা বললেন, না। চায়ের দোকানের এক ছেলে বলল, কুমিল্লার নবীনগরে বাড়ি। আগে শুনেছিলাম চাঁদপুর।

'লোকাল কাউকে খুঁজে বের করতে হবে। এই লাশ নবীনগরে কে নিয়ে যাবে? দেখি কোন খোঁজ করতে পারি কি-না। চায়ের দোকান, সিগারেটের দোকান এইসব জায়গায় খোঁজ করতে হবে। আশপাশের লন্ড্রীতে পাত্তা লাগাতে হবে। দেখি কি করা যায়।'

নাসিমুদ্দিন মামা অসাধ্য সাধন করলেন। খোঁজ বের করলেন, এসি দাস রোডের এক মেসে কুদ্দুসের চাচাতো ভাই থাকে। সেও ড্রাইভার। ট্রাক চালায়। ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা — আমাকে বলা হল কুদ্দুসের ভাইয়ের সন্ধানে যেতে।

সিনেমাতে ডাকাতদলের গোপন আড্ডা যে রকম থাকে, মেসটা অবিকল সে রকম। পয়সা দিয়ে তাস খেলা হচ্ছে। বিড়ির উৎকট গন্ধে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। তারা দুপুরের খাবার শেষ করে তাস নিয়ে বসেছে। ময়লা থালাবাসন উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। বড় বড় নীল মাছি ভন্ ভন্ করছে। তাস খেলোয়াড়রা আমার দিকে খুবই সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল। কুদ্দুসের ভাইটির কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, কি জন্যে দরকার?

দরকারের বিষয়টা ভেঙে বলার পরও সন্দেহ যায় না। একজন জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, আফনে কি করেন? ছাত্র শোনার পর তাদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কুদ্দুসের ভাই এখানে থাকে কি থাকে না, এটা বলতে অসুবিধা আছে?

'থাকে। এইখানেই থাকে।'

'এখন কোথায়?'

'ট্রিপে গেছে।'

'কোথায় গেছে? কখন আসবে?'

'তা তো ভাইজান বলতে পারি না। গেছে বগুড়া। আরিচা ঘাটে আটকা পড়লে সাত দিনের মামলা। আর আটকা না পরলে ধরেন তিনদিন।'

আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয়ে এলাম। দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এখন আর কেউ বলতে পারবে না — আমরা খোঁজ-খবর করিনি। কুদ্দুসের আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে বলা যাবে যে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

বাসায় ফিরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ছোটচাচীর বাবা গোলাপ-প্রেমিক জাজ সাহেব এসেছেন। তাঁকে খাতির করে চা দেয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বড়চাচা এবং বড়চাচী আছেন। কথা বলছেন নিচু গলায়। তঁদের চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ আন্তরিক আলাপ হচ্ছে। এরকম তো হবার কথা না। রহস্যটা কি?

মাকে গিয়ে বললাম, ব্যাপার কিছু জান মা? মিলমিশ হয়ে গেছে না-কি?

মা বললেন, বুঝতে পারছি না। শুনলাম তোর ছোটচাচা না-কি ঐ বাড়িতে টেলিফোন করেছিল।

'কখন?'

'দুপুরে। জাজ সাহেব টেলিফোন পেয়েই এসেছেন।'

'ছোটচাচা কোথায়?'

'জানি না।'

'আমাদের নার্স-চাচী?'

'সেও নেই। দুজনের কেউ নেই।'

দুপুরে বাড়িতে কিছু রান্না হয়নি। মরা-বাড়িতে আগুন ধরাতে নেই, এরকম একটা নিয়ম না-কি আছে। হোটেল থেকে আনা খাবার সবাই খেয়েছে। শুধু বড়চাচী খাননি। চোখের সামনে একটা ডেডবডি নিয়ে তিনি সলিড কিছু খেতে পারবেন না। একটা পেপসি এনে খেয়েছেন। সেই পেপসিও বমি করে ফেলে দিয়েছেন।

ডেডবডি রাখা হয়েছে কুদ্দুসের ঘরে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। একটা বড় প্যাকিং বক্সে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে। সেই বরফ গলে পানি চুইয়ে আসছে। বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেপুলেদের ভিড়। পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর চোখে সানগ্লাস। এই ভদ্রলোক কথা বলছেন বাবার সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে সবাই মোটামুটি মধুর স্বরে কথা বলে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় অতি বুদ্ধিমান লোকের মুখেও বোকা-বোকা একটা ভাব চলে আসে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবার মধ্যে তা দেখলাম না, বরং মনে হল তিনি ঝগড়ার সুরে কথা বলছেন।

আপনাদের এইসব নিয়ম-কানুনের মানেটা কি দয়া করে বলুন তো? চাক্ষুষ সাক্ষী-প্রমাণ আছে, বোমা ফেটে লোকটা মারা গেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেটেও এই কথা লিখে দিয়েছেন। এরপর আবার পোস্টমর্টেম কি? এতগুলি মানুষের সাক্ষী-প্রমাণ আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না?

'জ্বি-না। আপনারা মিথ্যাও বলতে পারেন।'

'নাড়িভুঁড়ি কেটে ডাক্তার যা বলবে, সেটাই সত্যি? ঐ ডাক্তার মিথ্যা বলতে পারেন না?'

'অবশ্যই পারেন। মাঝে মাঝে তাঁরাও মিথ্যা বলেন। তবু নিয়ম বলে একটা কথা।'

'এইসব নিয়ম তুলে দেন না কেন?'

'নিয়মগুলি ভাল, মানুষ হচ্ছে খারাপ। মানুষ ভাল হলে এইসব নিয়ম-কানুনের দরকার ছিল না।'

শেষ পর্যন্ত পোস্টমর্টেম করাতে হল না। নাসিমুদ্দিন মামা সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকে বললেন, আরো তিনশ' কুড়ি টাকা দরকার। নিজের পকেট থেকে চলে গেছে। এখন কবর কোথায় হবে সেটা বলেন, এইখানেও টাকার ব্যাপার আছে।

সমস্ত দিন আমার উপর খুব ধকল গিয়েছে। বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি, ওম্নি ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। শুধু ঘুম না, ঘুমের সঙ্গে স্বপ্নও দেখে ফেললাম। স্বপ্নটা কুদ্দুসকে নিয়ে। স্বপ্নের মধ্যে কুদ্দুস বেঁচে আছে। আমাকে এসে বললো, ছোটমামা,

এগারটা টাকা দিতে পারবেন? এগারটা টাকা শর্ট পড়েছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি আমাকে মামা ডাকছ কেন কুদ্দুস? আমাকে না সবসময় ভাই ডাকতে?

'কিছু মনে করবেন না ভাইজান, ভুল হয়ে গেছে। টাকার অভাবে মাথা ঠিক নেই। কি বলতে কি বলি। শেষ সময়ে এগারটা টাকা শর্ট পড়ল।'

'আরেকটা কথা কুদ্দুস, তুমি না মারা গেছ। তাহলে কথা বলছ কি করে?'

স্বপ্নের এই পর্যায়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি মাথার কাছে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার গা ঝাঁকাচ্ছেন। বাবা বললেন, তোর একটু নবীনগর যাওয়া লাগে। কুদ্দুসের বৌ-ছেলেমেয়ে আছে, এদের শেষদেখা দেখানো দরকার।

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, এখন নবীনগর যাব?

'হ্যাঁ। তুই একা যাবি না। তোর সঙ্গে ভোলাবাবুও যাবে। ভাগ্য ভাল, হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। নিজে থেকেই সঙ্গে যেতে রাজি হল।'

'যাব কিভাবে?'

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিস কেন? এটা আবার কোন্ দেশী ভদ্রতা? আর ঘুমটাই-বা তোর এল কিভাবে? এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, বাড়িতে ডেডবডি।'

আমি বাবার সঙ্গে একতলায় নেমে এলাম। কুমিল্লা যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। কুদ্দুসের ভাই এসেছে। তার বগুড়া যাওয়া হয়নি। আরিচা ঘাটে গণ্ডগোল হওয়ায় ফিরে এসেছে। ফিরে এসে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে কোত্থেকে যেন একটা ট্রাক যোগাড় করেছে।

ডেডবডি ট্রাকে তোলা হয়েছে। ভোলাবাবুও ডেডবডির সঙ্গে ট্রাকের পেছনে বসে আছেন। আমাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। কাছে যেতেই বললেন, ড্রাইভারের সঙ্গে বসে কি করবেন? পিছনে চলে আসেন, হাওয়া খেতে খেতে যাব। সিনসিনারি দেখব। আমি পিছনেই উঠলাম। ট্রাক ছাড়ল সন্ধ্যার আগে আগে। ভোলাবাবু বললেন, পেছনে উঠার একটাই অসুবিধা, সিগারেট খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না।

আমি কিছু বললাম না। ভোলাবাবু বললেন, কিছু চিন্তা করছেন না-কি ভাইজান?

'জ্বি না।'

'মানুষ কখন কোথায় থাকবে বলা খুব মুশকিল। আমি এই বাড়িতে এসেছিলাম কি জন্যে জানেন? বড় সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার করতে। একটা লুঙ্গি কিনব। এগারটা টাকা শর্ট পড়ে গেল। ভাবলাম, বড় সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে আসি। এসে দেখি এই ব্যাপার।'

'কত টাকা শর্ট পড়েছে বললেন?'

'এগার টাকা।'

আমি অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এগার টাকার কথা বলছে কেন? স্বপ্নেও আমি কি ঠিক এই দৃশ্যই দেখিনি? স্বপ্নেও তো কুদ্দুস এ রকম ফতুয়ার মত একটা পোশাক পরে এসে বলেছিল, ভাইজান, এগারটা টাকা শর্ট পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়? আর কিছুই কি এর মধ্যে নেই?

'ভাইজান কি ভাবেন?'

'কিছু ভাবি না।'

'ভাবনের কিছু নাই। এই মানুষটা মরে আপনাদের খুব সুবিধা করে দিয়ে গেল। এখন দেখবেন আর কোন চিন্তা নাই।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'এখন মিলমিশ হয়ে যাবে। কুমিল্লার কাজ শেষ করে ঢাকায় যখন ফিরবেন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা। আপনার ছোটচাচী ফিরে আসছেন। তাঁর অসুখও আর নাই। মাঝখান থেকে এই বেচারা শেষ।'

'এইগুলি কি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী?'

'জ্বি।'

'ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়?'

'জ্বি হয়। ভাইজানের সঙ্গে কি সিগারেট আছে?'

'আছে।'

আমি সিগারেট বের করে দিলাম। ভোলাবাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মানুষ যখন বলে হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, তখন খুব মজা লাগে ভাইজান। মনে মনে হাসি আর বলি, তুমি কি করবা? তোমার কি করার কোন ক্ষমতা আছে? ফালাফালি কইরা তো লাভ নাই। কি কন ভাইজান?

'তা তো ঠিকই।'

'একটা শ্যামা সঙ্গীত শুনবেন ভাইজান?'

'না, থাক।'

'আচ্ছা থাক।'

থাক বলেও গুন গুন করে ভোলাবাবু কি যেন গাইতে লাগলেন। আমার ঘুম পেতে লাগল। কুদ্দুসের বাড়ি পৌঁছলাম গভীর রাতে, আধো-ঘুম ও আধো-জাগরণে।

আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্না ঢাকা গ্রাম। অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ। একজন বুড়োমানুষ লণ্ঠন হাতে বের হয়ে এলেন এবং অবাক হয়ে বললেন, আপনারা কারা বাবাসগল?

রিমির কাছ থেকে পর পর তিনটি অদ্ভুত চিঠি পেলাম।

প্রথম চিঠিটির উপরে লেখা — "প্রথম কবিতা"। তার নিচে আট লাইনের এক ইংরেজি কবিতা। অনেক চেষ্টা করেও সেই কবিতার কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। কবিতার নিচে রিমির নাম লেখা। সে নিজেই কবিতার রচয়িতা কি-না, কে জানে।

দ্বিতীয় চিঠির উপরে লেখা "দ্বিতীয় কবিতা"। আট লাইনের একটা বাংলা কবিতা। এই কবিতার নিচেও 'রিমি' লেখা। বাংলা বলেই বোধহয় এই কবিতাটির অর্থ বোঝা যায় —

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত,
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিতো দু'চারটে তার পাতা,
আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে।

তৃতীয় চিঠির শিরোনাম হচ্ছে —"প্রেসক্রিপশন"। সেখানে সত্যি সত্যি কি-সব ওষুধপত্রের নাম লেখা। ক্লোরামফেনিকল, ডোজ — প্রতি একশ' সিসি ওজনের জন্যে চার থেকে পাঁচ সিসি। বার ঘণ্টা পর পর। এসবের মানে কি? আমি রিমিদের বাসায় টেলিফোন করলাম। ফোন ধরলেন খালা। খালা টেলিফোন ধরবেন, এই ভয়ে আমি রিমিকে কখনো টেলিফোন করি না।

'তোদের খবর কি-রে?'

'খবর ভাল।'

'কি-সব যেন শুনছি — তোর ছোটচাচী না-কি ফিরে এসেছে?'

'এখনো আসেননি, তবে এসে যাবেন বলে মনে হচ্ছে।'

'তোদের কাণ্ডকারখানা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ নার্স মেয়ে এখন কোথায় থাকে?'

'বাসাতেই থাকে?'

'বাসাতেই থাকে, আর কেউ কিছু বলে না?'

'বলার তো কিছু নেই, নিজের অধিকারে সে আছে।'

'অধিকার! অধিকার আবার কি?'

আমি চুপ করে রইলাম। অধিকার ব্যাখ্যা করার যন্ত্রণায় যেতে ইচ্ছে করছে না। দীর্ঘ বক্তৃতায় লাভও কিছু নেই। খালার কানে হাই পাওয়ারড্ আয়না জাতীয় কিছু আছে। কথা যা বলা হয় ঐ আয়নায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

'হ্যালো টুকু।'

'জ্বি।'

'কথা বলছিস না কেন?'

'কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না, তাই বলছি না।'

'তার মানে?'

'মানে কিছু নেই। আপনি কি কাইন্ডলি একটু রিমিকে দেবেন?'

খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর ভারী করে বললেন, রিমিকে কেন?

'একটু দরকার ছিল।'

'কি দরকার?'

'আপনাকে বলা গেলে তো শুরুতেই বলতাম। আপনাকে বলা যাবে না।'

খালা খানিকক্ষণ কোন কথা বললেন না। রিমির সঙ্গে আমার কি দরকার থাকতে পারে, তাই নিয়ে সম্ভবত ভাবতে বসলেন। আমার মনে হল, তিনি রিমিকে ডেকে যে দেবেন না সেই অজুহাত তৈরি করতে তাঁর সময় লাগছে। আমি আবার বললাম, রিমিকে একটু ডেকে দেবেন খালা?

'ওকে তো ডাকা যাবে না।'

'ডাকা যাবে না?'

'না। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঘুমিয়ে পড়ল?'

'ইয়ে, ওর খুব মাথা ধরেছে। বাতি-টাতি নিভিয়ে শুয়ে আছে। বলে দিয়েছে যেন তাকে ডিসটার্ব না করা হয়। এখন ডাকতে গেলে খুব রাগ করবে।'

'তাহলে থাক, ডাকার দরকার নেই। একটা জরুরি কথা ছিল। থাক, অন্য সময় বলব।'

এই বলেই মনে মনে হাসলাম, কারণ খালার কৌতূহল এখন তুঙ্গে উঠেছে। রিমিকে না ডেকে পারবেন না। তাকে ডাকবেন এবং টেলিফোনের কথাবার্তা শোনার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

খালা বললেন, জরুরি কথাটা আমাকে বল। ও ঘুম থেকে উঠলে বলে দেব।

'আপনাকে বলা ঠিক হবে না। ভয়-টয় পাবেন।'

'ভয় পাব কেন? ব্যাপারটা কি?'

'আপনাকে বলা যাবে না খালা। আচ্ছা রাখি . . .'

'একটু লাইনে থাক, আমি দেখি রিমিকে আনা যায় কি–না।'

আমি টেলিফোন কানে নিয়ে বসে রইলাম। খালা রিমিকে ডাকতে গেলেন।

'রিমি টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়েই শীতল গলায় বলল, কাল সকাল দশটায় নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানগুলির আশেপাশে থাকবি।'

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে খট্ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি বৃথাই খানিকক্ষণ হ্যালো হ্যালো করলাম।

মনস্থির করে ফেললাম, আগামীকাল সকাল দশটায় নিউমার্কেটের ধারে–কাছেও আমি থাকব না। আমাকে না দেখে সে অবাক হবে, দুঃখিত হবে, বিস্মিত হবে। এই তিন ধরনের অনুভূতি একত্রে খানিকক্ষণ খেলা করবে, তারপর রাগে তার শরীর জ্বলে যাবে। জ্বলুক। ডাক দিলেই কি ছুটে যেতে হবে? রূপবতীদের একসময়–না–একসময় বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের ডাক নিশিডাকের মত না। তাদের ডাকও অগ্রাহ্য করা যায়।

তাছাড়া ওর ডাকে ছুটে যাওয়া মানে সেধে অপমানিত হওয়া। একবার ঠিক দুপুর দু'টায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে বলল। কাঁটায় কাঁটায় দু'টার সময় আমি যেন দু'প্যাকেট চিপস্ এবং এক প্যাকেট কাজুবাদাম নিয়ে উপস্থিত থাকি। বোটানিক্যাল গার্ডেন কি এখানে? মীরপুর ছাড়িয়েও আরো অনেকখানি। দুপুরে না খেয়ে তিনবার বাস বদল করে ঘামতে ঘামতে পৌঁছলাম। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত গেটে লাইটপোস্টের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। রিমির দেখা নেই। খিদেয় অস্থির হয়ে চিপস্ এবং কাজুবাদাম নিজেই খেয়ে ফেললাম এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় পর পর তিনবার বললাম, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না।

তবে নিউমার্কেট হাতের কাছে। ইচ্ছা করলে একবার উঁকি দিয়ে দেখা যায়। এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আমি জানি ইচ্ছা করবে। দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মনে হবে বিশ্ব–সংসার রসাতলে যাক, আমি নিউ মার্কেটে যাব।

আগামীকাল বাসায় থাকা আমার খুবই জরুরি। কারণ মির‍্যাকল ঘটে গেছে। ছোটচাচী সত্যি সত্যি চলে আসছেন। দুই পক্ষের কথাবার্তায় ঠিক হয়েছে অতীত ভুলে নতুন করে সব শুরু করা হবে। পুরানো কথা তোলা হবে না। যা হবার হয়ে গেছে। নার্স মেয়েটিকে টাকাপয়সা দিয়ে বা অন্য কোনভাবে ব্যবস্থা করা হবে। সবার ধারণা, এই মেয়ে বেঁকে বসবে। এ রকম কিছু হলে শক্ত হতে হবে। দরকার হলে ভয় দেখাতে হবে। ছোটচাচা তাঁর ফাইন্যাল কথা বলে দিয়েছেন। তিনি আমার মাকে ছাদে ডেকে নিয়ে বলেছেন — আপনারা যা ভাল বোঝেন করেন, আমার কিছু বলার নেই। মা এই কথা শুনে বিজয়ীর ভঙ্গিতে নেমে এসেছেন।

আজ রাতে সমিতাকে বড়চাচার ঘরে ডাকা হবে। সেখানে শুধু মুরুব্বীরা থাকবেন। তাঁরা তাকে বোঝাবেন, দরকার হলে ভয় দেখাবেন। এই আসরে ছোটচাচীর বাবা জাজ সাহেবও থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে। বড়চাচা বলেছেন, আমাদের সমস্যা আমরাই মেটাব। আপনি মুরুব্বী মানুষ। আপনার থাকার দরকার নেই। জাজ সাহেব বলেছেন, লিগ্যাল পয়েন্টগুলি মেয়েটিকে ভালমত বুঝিয়ে দেবেন। তাকে পরিষ্কার বলবেন যে, তার বিয়ে অসিদ্ধ। কোর্ট এ্যাকসেপ্ট করবে না। আমরা কোর্টে প্রমাণ করে দেব যে, ছেলেকে ট্র্যাপে ফেলে এই বিয়ে করা হয়েছে। বিয়ের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থ আত্মসাৎ। এটা প্রমাণ করা গেলে তারই বিপদ, উল্টো জেল খাটতে হবে। আপনারা বলবেন যে আমরা কোর্ট-ফোর্টের ঝামেলায় যাব না। শান্তিপূর্ণ সমাধানই আমাদের লক্ষ্য।

বড় চাচা বললেন, সব পয়েন্ট বলা হবে।

'শুধু পয়েন্ট বললে হবে না — থ্রেট করতে হবে। এই জাতীয় মেয়েরা তেড়িয়া কিসিমের হয়। এদের ঘাড়ের রগ থাকে একটা মোটা।'

'কারেক্ট বলেছেন। একটা না, এদের ঘাড়ের সব ক'টা রগ থাকে মোটা।'

দেখা গেল সমিতা নামের মেয়েটির ঘাড়ের রগ মোটা নয়, সে তেড়িয়া কিসিমেরও নয়। বড়চাচার ঘরের মাঝখানের চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। আমি তার মুখের ভাব দেখতে পারছিলাম না। কারণ, আমি ঘরের বাইরে জানালার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটির পিছনটা দেখতে পাচ্ছি।

বড়চাচা বললেন, আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

'না।'

'বলার থাকলে বলতে পার। আমরা তোমার কথাও শুনব। আমরা ঝগড়া করতে বসিনি।'

'আপনারা কি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন?'

'অবশ্যই?'

'আপনার ছোটভাই অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব, তিনিও কি তাই চান?'

'সে না চাইলে আমরা মিটিং-এ বসলাম কেন? সে-ই বেশি চাইছে।'

'বেশ, আমি চলে যাব।'

বড়চাচা অত্যন্ত রাসভারী গলায় বললেন, তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পারো। আমরা শুনব।

'আমার কিছুই বলার নেই।'

'তুমি যদি মনে কর কোর্টের আশ্রয় নেবে, তাহলে ভুল করবে।'

'আপনাদের চিন্তার কিছুই নেই। আমি কোর্টে যাব না।'

'অবশ্যি তুমি চাইলে কমপেনসেশনের ব্যাপারটা নিয়েও আমরা চিন্তা করব। এটা আমরা পুরোপুরি রুল আউট করে দিচ্ছি, তা না। যদিও লিগ্যালি ইউ আর নট বাউন্ড।'

সমিতা সবাইকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, আমি তাহলে যাই।

'এখনি যাবে?'

'হুঁ। মেয়েটা থাকবে। কোথায় গিয়ে উঠবো কোন ঠিক নেই। আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করে তারপর ওকে নিয়ে যাব।'

'এখনই যে যেতে হবে, তা না। কাল ভোরে মেয়েটাকে নিয়ে একসঙ্গে যাও।'

'আপনাদের ভয় করার কিছু নেই। মেয়েটাকে আমি আপনাদের ঘাড়ে ফেলে রেখে যাব না। নিয়ে যাব। দু'-এক দিনের মধ্যেই নেব। আমি যাব আজ রাতেই।'

সবার বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। এত বড় একটা ঝামেলা এত সহজে মিটে যাবে, তা কেউ ভাবেনি।

সমিতা আমার ঘরে ঢুকে খুব সহজ গলায় তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলল। তাদের পুরো কথোপকথনটি হল আমার সামনে। যেন সমবয়েসী দু'জন মানুষ কথা বলছে।

'মা-মণি, আমি আজ রাতে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'আমিও কি যাচ্ছি?'

'না, তুমি আরো দু'-একদিন থাকবে। পারবে না?'

'পারব।'

'আগের বাসাটা তো ছেড়ে দিয়েছি। কোথায় গিয়ে উঠব তা তো জানি না। কাজেই এখন তোমাকে নিচ্ছি না। বুঝতে পরছ?'

'পারছি। মা, ওরা কি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, ওরা তাড়িয়ে দেবে।'

'তাহলে মা-মণি আমি এখন যাই?'

'আচ্ছা যাও।'

সমিতা ঘর থেকে বের হবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কি কিছু বলবে?

লোরেটা শান্ত গলায় বলল, এই ক'দিন কি আমি স্কুলে যাব?

'দরকার নেই। একা একা এত দূর যেতে পারবে না।'

'টুকুকে বললে ও আমাকে নিয়ে যাবে।'

সমিতা বিস্মিত হয়ে বলল, নাম ধরে ডাকছ কেন?

'ও তো আমার বন্ধু, কাজেই নাম ধরে ডাকছি। ও আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলেছে।'

সমিতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ যখন তাকায় তখন তার চোখের ভেতর দিয়ে তাকে অনেকখানি দেখা যায়। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সমিতা নামের এই মেয়েটি তো বড় ভাল। আমি বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওকে দেখেশুনে রাখব।

সমিতা কিছু বলল না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

রাত ন'টায় একটি বেবিট্যাক্সি ডেকে আনা হল। সমিতা একটা বড় স্যুটকেস, একটা হ্যান্ডব্যাগ, এবং একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে পেছনের সীটে উঠে বসল। বিদায়ের সময় পুরুষদের কাউকে দেখা গেল না, তবে মেয়েরা সবাই এল। মা বললেন, টুকু, তুই ওর সঙ্গে যা। রাত হয়েছে, পৌঁছে দিয়ে আয়।

সমিতা 'না'-সূচক কিছু বলতে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত বলল না। সম্ভবত তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। আমি ড্রাইভারের পাশে জায়গা করে বসে পড়লাম। গাড়ি উত্তর শাহজাহানপুর ছাড়িয়ে প্রায় বস্তির মত কিছু ঘরবাড়ির সামনে থামল। জায়গাটা ঢাকা শহরের ভেতরে হলেও ইলেকট্রিসিটি নেই। কাছেই কোথাও মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা ফেলে নিচু জায়গাটা ভরাট করা হচ্ছে। সেই আবর্জনার ভয়াবহ উৎকট গন্ধ। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। আমি বললাম, স্যুটকেসটা আমাকে দিন। মেয়েটা বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুটকেস দিল। বেবিট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা রওনা হলাম। সারাপথ কথাবার্তা হল না। একটা একতলা দালানের সামনে এসে সমিতা বলল, এই বাড়ি।

আমি স্যুটকেস নামিয়ে নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত।

সমিতা অসম্ভব নরম গলায় বলল, কেন?

আমি সেই 'কেন'-র জবাব দিতে পারলাম না। স্যুটকেস নামিয়ে রেখে এলাম। বেবিট্যাক্সির কাছে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সমিতা তখনো ঘরে ঢোকেনি। তার জিনিসপত্র নিয়ে অন্ধকারে একতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক করে রেখেছিলাম, সকাল সাড়ে দশটায় নিউমার্কেটে যাব না। রিমি রাগ হলে হোক, বিরক্ত হলে হোক।

যে রকম ভেবে রেখেছিলাম, সে রকম করা গেল না। আমি সাড়ে দশটা বাজার পনেরো মিনিট আগেই এসে উপস্থিত হলাম। বারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করলাম বইয়ের দোকানগুলির সামনে। রিমির দেখা নেই। সাড়ে বারোটায় এক ডিসপেনসারি থেকে টেলিফোন করলাম। রিমি বাসাতেই আছে। আমি আহত স্বরে বললাম, রিমি, তোর না আসার কথা! রিমি বলল, আমি আসব এমন কথা তো বলিনি। তোকে আসতে বলেছি।

'কেন?'

'এম্নি।'

'এম্নি কেন?'

'এম্নি মানে এম্নি। আচ্ছা শোন, তুই প্রেসক্রিপশনটা পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, কিসের প্রেসক্রিপশন?'

'ঘোড়া এবং গরুর অসুখ বিসুখ হলে এই প্রেসক্রিপশন পশু ডাক্তাররা দেন। তোকে দিচ্ছি, কারণ, তোর কাজে লাগবে।'

'ও আচ্ছা।'

'রাগ করলি নাকি?'

'না।'

'তোর কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে রাগে কাঁপছিস।'

'কিছুটা রাগ যে করিনি, তা না। তবে রাগে কাঁপছি না।'

'আচ্ছা, আমি কি তোর সঙ্গে একটু ঠাট্টাও করতে পারব না?'

'ঠাট্টা!'

হ্যাঁ ঠাট্টা। আজ দিনটা ঠাট্টার জন্যে চমৎকার। তুই ভুলে বসে আছিস, আজ তোর জন্মদিন। গত জন্মদিনে তোকে বলেছিলাম না আগামী জন্মদিনে তোকে ঘোল খাওয়াব? মনে পড়েছে?

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'এখনো রাগ আছে?'

'না।'

'তোর জন্যে একটা উপহার কিনে গতকাল নওরোজ কিতাবিস্তানে দিয়ে এসেছি। ওখানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেবে।'

'এটাও নিশ্চয়ই ঠাট্টা?'

'না, ঠাট্টা না। পরপর দুবার ঠাট্টা করা যায় না। লেবু একবারই কচলানো যায়। দু'বার কচলালে তেতো হয়ে যায়। উপহার তোর পছন্দ হয়েছে কি-না জানাবি। সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লিখে জানাবি।'

'আর যদি অপছন্দ হয়?'

'অপছন্দ হলে চিঠি-ফিটি লিখতে হবে না। তবে অপছন্দ হবে না। যদিও তোর রুচি খুব খারাপ।'

'থ্যাংকস।'

'থ্যাংকস কেন? উপহারের জন্যে? না-কি জন্মদিন মনে রাখার জন্যে?'

'জন্মদিন মনে রাখার জন্যে।'

'তোর নিজের মনে ছিল না। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তুই যা। নওরোজ কিতাবিস্তানে চলে যা। গিয়ে আমার নাম বলবি।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। থ্যাংকস এগেইন।'

'বার বার থ্যাংকস দিতে হবে না। এটা বিলেত–আমেরিকা না। ফোন রাখলাম। হ্যাপী বার্থ ডে টু ইউ।'

আমি সেই দোকানে গেলাম। দোকানের মালিক অবাক হয়ে বললেন, কই, আমাদের কাছে তো কেউ কিছু দিয়ে যায়নি।

৬

আমাদের দেখে কে বলবে চার দিন আগেই আমরা ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছিলাম? কেউ বলবে না।

বলার কথাও নয়।

এখন সব স্বাভাবিক। বড়চাচা ব্যাগ বোঝাই করে বাজার করছেন। শীতের নতুন আনাজ উঠেছে — অবিশ্বাস্য দামে তিনি সেসব কিনে হাসিমুখে বাড়ি ফিরছেন এবং সবাইকে ধাঁধা ধরার মত করে বলছেন, বল তো, টমেটো কত করে আনলাম?

কি, বলতে পারলে না? একজেক্ট ফিগার বলতে পারলে দশ টাকা দেব।

মীরা সম্ভবত আবার কোন ছেলের প্রেমে পড়েছে। একটি বিরহের গান দিনে পঞ্চাশ বার বাজাচ্ছে। গানের ভাব হচ্ছে — তুমি আর আমি দুই পথের যাত্রী। এই জীবনে দুই পথ এক হবে না ইত্যাদি। শুটকো মত একটা ছেলেকে ঘাড় কুঁজো করে প্রায়ই আমাদের বাসার সামনের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই ছোকরাই মীরার সাম্প্রতিক প্রেমিক। রূপবতী মেয়েরা প্রেমিক হিসেবে কুৎসিত ছেলেদের বেশি পছন্দ করে কেন কে জানে।

ছোটচাচা ফিরে এসেছেন। রোগি দেখা শুরু করেছেন। রোগি আসছে স্রোতের মত।

ছোটচাচীও ফিরে এসেছেন। তাঁর ঘন ঘন অসুখ হবার ঝামেলাটা এই শীতে একটু কম বলে মনে হচ্ছে। গতকাল আমার সঙ্গে হাসিমুখে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। আলাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে — তিনি শিগ্‌গিরই বাচ্চা নেবার কথা ভাবছেন। যদিও বাচ্চা নেয়া মানেই ফিগারের দফা–রফা, তবু নেবেন। ব্রেস্ট ফিডিং না করালেই হল। আলাপের এক পর্যায়ে বলল, মেয়েদের বুকের সেইপ নষ্ট হয়ে গেলে তো সবই নষ্ট। তাই না টুকু?

আমি উত্তর না দিয়ে ঢোঁক গিললাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, তুমি দেখি লজ্জায় একেবারে বেগুনি হয়ে যাচ্ছ। লজ্জা পাবার মত কি বললাম? যা বলেছি সবই সত্যি। হার্ড ফেক্ট। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

পত্র পুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাতা পূজার কুসুম দু'টি।

রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবেরই যদি এই ভাব হয় তাহলে সাধারণ পুরুষদের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ . . .।

আলোচনা বেশিদূর এগুতে না দিয়ে আমি চলে এলাম। এ বাড়ির সবাই সুখে আছে এটাই আমার সুখ। তবে কুসুমে কাঁটার মত একটা কাঁটা এখনো আছে। সমিতা তার মেয়েটিকে নিয়ে যায়নি। বাড়ির কেউ তা নিয়ে চিন্তিতও না। মেয়েটি কান্নাকাটি করছে না, হৈ-চৈ করছে না, এতেই সবাই খুশি। আমি তাকে রোজ স্কুলে দিয়ে আসছি, স্কুল থেকে নিয়ে আসছি। সে একবারও তার মা'র কথা জিজ্ঞেস করছে না। আমিও নিজ থেকে কিছু বলছি না।

রাতে ঘুমুবার আগে দু'জন বয়স্ক মানুষের মত খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। আমার জন্মদিনে রিমি যে কাণ্ডটা করল আমি তা বেশ সহজভাবেই তাকে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, রিমির এই কাজটা কি উচিত হয়েছে?

লোরেটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, উনি তোমাকে খুব পছন্দ করে তো, তাই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। পছন্দের মানুষকে কষ্ট দিতে খুব ভাল লাগে।

'কে বলল তোমাকে?'

'মা বলেছে। এই যে মা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে না, তার কারণ মা আমাকে পছন্দ করে।'

'তুমি ঘুমাও।'

'আচ্ছা।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার মনটা এতই খারাপ হল যে, ঘুম এল না। ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। বড় বড় নিঃশ্বাস নিলাম। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন শরীরে নিলে না-কি ঘুম পায়। ঘুম পেল না। তৃষ্ণা পেয়ে গেল।

আজ ঘরে পানির জগ রাখতে ভুলে গেছি। নামতে হল একতলায়। পর পর তিন গ্লাস পানি খাবার পরও তৃষ্ণা মিটল না। তৃষ্ণা ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। মাঝে মাঝে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে সত্যি, না সবার ক্ষেত্রে — তা জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বসার ঘর থেকে নাক ডাকার অদ্ভুদ শব্দ আসছে। সন্ন্যাসী ভোলাবাবু নাক ডাকাচ্ছে। কিছুদিন ধরে এই সন্ন্যাসী রোজ আসছে। বড় চাচার সঙ্গে গুজ গুজ, ফিস ফিস করছে। রাতে বসার ঘরের কার্পেটে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দারোয়ান বা মালীর ঘরে সে ঘুমুবে না, ঘুমুবে বসার ঘরে। আমার মা'র ধারণা, এই ব্যাটা একরাতে আমাদের খুন-টুন করে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবে। মা তার এই আশংকার কথা অনেককেই বলেছেন, কেউ আমল দেয়নি।

বসার ঘরে উঁকি দেবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না — সম্ভবত নাক ডাকার শব্দে আকৃষ্ট হয়েই উঁকি দিলাম। ঘর অন্ধকার, সন্ন্যাসী নাক ডাকাচ্ছে অথচ আমি পা দেয়ামাত্র সে ভারী গলায় বলল, ভাইজানের কাছে সিগারেট আছে? আমি হকচকিয়ে গেলাম।

'আছে ভাইজান সিগ্রেট?'

'আপনি কি জেগে ছিলেন না-কি?'

'জ্বি-না, ঘুমাচ্ছিলাম।'

'আমি ঘরে পা দেয়ামাত্র ঘুম ভেঙে গেল?'

'জ্বি।'

'এবং এই অন্ধকারেও বুঝতে পারলেন — আমি কে?'

'জ্বি।'

'কিভাবে বুঝলেন? আপনি কি অন্ধকারে দেখতে পান?'

'জ্বি-না। অন্ধকারে দেখব কিভাবে? আমি তো আর বিড়াল না।'

'তাহলে বুঝলেন কি করে যে এটা আমি।'

'গন্ধ থেকে বুঝলাম।'

'গন্ধ থেকে বুঝে গেলেন?'

'জ্বি। সব মানুষের শরীরের গন্ধ আছে। মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের মিল নাই, এক মানুষের গন্ধের সঙ্গেও আরেক মানুষের গন্ধের কোন মিল নাই।'

'আপনি কি সবার গন্ধ আলাদা করে চেনেন?'

'জ্বি-না। যাদের সাথে কয়েকবার দেখা হয়, তাদেরটা চিনি। সিগ্রেট আছে ভাইজান?'

'সঙ্গে নেই, তবে ঘরে আছে।'

'থাক, বাদ দেন। তিনতলায় যাবেন আবার নামবেন। দরকার নাই।'

'দরকার না হলে তো ভালই। যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি — তৃষ্ণা প্রসঙ্গে। আপনার কি কখনো এমন হয়েছে যে খুব পানির তৃষ্ণা হয়েছে, পানি খেয়েই যাচ্ছেন কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না?'

'না। শরীরের তৃষ্ণা তো সহজেই মেটার কথা। মনের তৃষ্ণা নিয়েই সমস্যা। ঐ তৃষ্ণাটা কখনো মিটে না।'

'এইসব কথাবার্তা আপনি কি ভেবে-চিন্তে বলেন, না যা মনে আসে বলে ফেলেন?'

'যা মনে আসে বলি। টুকু সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনাদের সমস্যা তো মিটে গেল।'

'তাই তো দেখছি।'

'ট্রাকে করে কুদ্দুসের ডেডবডি নিয়ে যাবার সময় আপনাকে বলেছিলাম না, এই মৃত্যুর পর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'তা বলেছিলেন।'

'ছোট্ট একটা সমস্যা অবশ্যি থেকেই গেল।'

'কোন সমস্যার কথা বলছেন?'

'বাচ্চা মেয়েটার কথা বলছি। লোরেটা বোধহয় নাম।'

'ওর কি সমস্যা?'

'আমার তো মনে হয় ওর মা তাকে নিতে আসবে না।'

'আপনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন?'

'জ্বি-না। অনুমানে বলছি। পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনো আসছে না — ভয়ংকর কিছু না হলে তো একজন মা কখনো এই কাজ করবে না। আচ্ছা, এখন যান ঘুমান গিয়ে।'

আমি বুঝলাম, সন্ন্যাসী পাশ ফিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক-ডাকা শুরু হল। সত্যি সত্যি কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে, না-কি আমাকে অভিভূত করবার জন্যে ভান করছে? সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রচুর ভান করতে হয়। তাদের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্যের একটি হচ্ছে ইমেজ রক্ষা। ব্যাটা সম্ভবত সারাক্ষণই জেগেছিল। নাক ডাকাটা তার কোন এক কৌশল। কৌশল হলেও মজার কৌশল। গন্ধের ব্যাপারটাও চমৎকার, তবে হকচকিয়ে যাবার মত কিছু নয়। কুকরের মত ঘ্রাণশক্তি কিছু মানুষের মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারে। পশুদের স্বভাব-চরিত্রের অনেক কিছুই তো মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

আমি দোতলায় উঠে এলাম, তবে সন্ন্যাসীকে মন থেকে পুরোপুরি তাড়াতে পারলাম না। একটা সিগারেট নিয়ে আবার কি ফিরে আসব? খানিকক্ষণ গল্প করব? মন্দ কি?

নিজের ঘরে ঢুকে আর নামতে ইচ্ছা করল না। ঘুম পেতে লাগল। প্রচণ্ড ঘুম পাওয়ার লক্ষণটা ভাল না। এই জাতীয় ঘুম বিছানায় যাবার আগ পর্যন্ত থাকে। বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। আমার বেলায়ও তাই হল। বালিশে মাথা রাখামাত্র ঘুম চলে গেল। ঘরে শুয়ে অনেক রকম পরিকল্পনা করলাম। তার একটি হল — বাচ্চা মেয়েটির মাকে খুঁজে বের করা।

আশ্চর্যের ব্যাপার ভদ্রমহিলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত এগারোটার দিকে যে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে এসেছিলাম সে বাড়িতে সমিতা ছিল মাত্র এক রাত। ভোরবেলাতেই স্যুটকেস নিয়ে চলে যায়। কোথায় যায় তাও বাড়ির কেউ জানে না। জানার আগ্রহও নেই। যেখানে ইচ্ছা যাক সবারই এরকম একটা মনোভাব।

আমি সারাদিনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুঁজতে লাগলাম। এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি। কেউই কিছু জানে না। গ্রামের বাড়িতে খোঁজ করব সেই উপায়ও নেই, কারণ ভদ্রমহিলার গ্রামের বাড়ি নেই। কোলকাতার মেয়ে। উনিশশ' ষাট সনে ঢাকায় এসেছে।

রাত এগারোটায় খোঁজার পর্ব বন্ধ করলাম। জায়গাটা খারাপ। যে কোন মুহূর্তে ঘড়ি, মানিব্যাগ, শার্ট, স্যুয়েটার খুলে নেবে। কপাল মন্দ হলে পেটে ক্ষুর ঢুকিয়ে দু'-একটা পোঁচ দেবে। আগে এসব ক্ষেত্রে চিৎকার-চেঁচামেচি করলে লোকজন ছুটে আসতো, এখন দৌড়ে উল্টো দিকে পালিয়ে যায়। বিটের পুলিশ হঠাৎ করে বধির হয়ে যায়, তাদের চলৎশক্তিও থাকে না। তারা উদাস দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা দেখে।

আমি ঠিক করলাম, রিমিদের বাসায় চলে যাব। রিমিদের বাসা কাছেই। সে গাড়ি করে নিশ্চয়ই আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। রিমিদের বসার ঘরে আলো জ্বলছে। ঢুকে দেখি, খালা সেজেগুজে বসে আছেন। তাঁর সামনে কালো জ্যাকেট পরা এক ভদ্রলোক। দুজনের সামনেই কফির কাপ। খালা ভ্রু কুঁচকে বললেন, তুই কি মনে করে?

'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম . . .'

'কোন খবর আছে, না এম্নি এসেছিস?'

'খবর নেই, এম্নি।'

'খালা বিরক্ত গলায় বললেন, দুপুররাতে মানুষের বাসায় আসার মানে কি? তোদের কি কাণ্ডজ্ঞান কখনো হবে না?'

আমি অপমান হজম করে হাসিমুখে বললাম, রিমি বাসায় আছে?

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? ও ঘুমুচ্ছে। তুই বোস এখানে, নাকি চলে যাবি?'

'বসি খানিকক্ষণ।'

আমি বসামাত্রই ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন। ভদ্রলোক মনে হল হিমালয়-বিশারদ। হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী খুব বিতং করে বলছেন —

'হরিদ্বার হচ্ছে হিমালয়ের সিংহ দরজা। কোলকাতা থেকে হরিদ্বার যাবার দু'টো ট্রেন আছে। একটা হচ্ছে দুন এক্সপ্রেস। রাত ন'টা দশ মিনিটে ছাড়ে। অন্যটা হচ্ছে জনতা এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব হচ্ছে পনেরশ' কিলোমিটার।'

খালা বললেন, পনেরশ' কিলোমিটার সমান কত মাইল?

"ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার হচ্ছে এক মাইল, কাজেই এবাউট . . . "

ভদ্রলোককে হিসেব শেষ করতে না দিয়েই খালা কিশোরীদের গলায় বললেন, আপনি এত কিছু জানেন?

ভদ্রলোক এর উত্তরে হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দরজার পর্দা

সরিয়ে রিমি ঢুকে বরফের মত গলায় বলল, টুকু, তুই ভেতরে আয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলাম। রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল, ঐ লোক কখন থেকে বক্ বক্ করছে জানিস?

'সন্ধ্যা থেকে?'

'না। দুপুর থেকে। দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে। তারপর থেকে বকবকানি চলছে।'

'যেতে চাচ্ছে না?'

'চাচ্ছে হয়তো, মা যেতে দিচ্ছে না। আমার অসহ্য লাগছে। তুই এসেছিস ভাল হয়েছে। এখন আমি মা'কে একটা ভয় দেখাব। তোকে ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দেব।'

'তাতে লাভ কি?'

'তোর কোন লাভ নেই, মা ভয়ে ছট্‌ফট্ করবে, এটাই লাভ।'

বলতে বলতে রিমি দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিল।

আমার গা ছম ছম করতে লাগল। রিমি বলল, খবর্দার, গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবি না। গায়ে হাত দিলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।

আমি ফিস ফিস করে বললাম, তুই এত পাগল হলি কিভাবে?

রিমি বিরক্ত স্বরে বলল, পাগলের তুই কি দেখলি? আমি যা করছি খুব ভেবে-চিন্তে করছি। মা'কে আজ আমি একটা শিক্ষা দেব।

খালা উঠে এসেছেন। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে আতংকিত স্বরে ডাকছে, রিমি, এই রিমি!

রিমি বলল, কী চাও মা?

'দরজা বন্ধ কেন?'

'আমরা গল্প করছি, এই জন্যে দরজা বন্ধ। গোপন গল্প তো। আমরা চাই না সবাই শুনুক।'

খালা ভাঙা গলায় বললেন, দরজা খোল মা।

'বিরক্ত করো না মা। এখন যাও।'

ঐ ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, কি হয়েছে?

খালা বললেন, কিছু হয়নি। রিমি না খেয়ে শুয়ে পড়েছে, তাই ডাকছি। আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন।

'ঐ ছেলেটা গেল কোথায়? আমি না হয় ঐ ছেলেটার সঙ্গে গল্প করতাম।'

খালা বললেন, ও চলে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে। বিচিত্র স্বভাব এই ছেলের। কাউকে কিছু না বলে চলে যায়।

খালার কথা শেষ হবার আগেই রিমি উচ্চু গলায় বলল, টুকু তো কোথাও যায়নি।

এখানেই আছে। আমরা গল্প করছি।

হুড়মুড় শব্দ শুনলাম।

খুব সম্ভব খালা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছেন।

আমি দরজা খোলার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, রিমি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, চুপ করে থাক, নড়বি না।

আমি অন্ধকারে অদ্ভুত মেয়েটার সঙ্গে বসে রইলাম।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারটার মত বাজল। বিরাট নাটক করে বের হলাম। খালার কান্না, দরজার ধাক্কাধাক্কি — কুৎসিত ব্যাপার। ঘর থেকে বের হবামাত্র খালা বললেন, আর কোনদিন যদি তোকে এ বাড়ির ত্রিসীমানাতে দেখি তাহলে জুতা দিয়ে পিটিয়ে লাশ বানাব। হারামজাদা কোথাকার!

রিমি বলল, মা, একে আমার সামনে ধমকা-ধমকি করবে না। আমরা বিয়ে করে ফেলেছি।

'কি বললি?'

'মুসলমানদের বিয়ে তো খুব সিম্পল — আমি তিনবার বলেছি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? সে বলেছে — কবুল। অর্থাৎ কবুল। **Now we are husband and wife.**'

খালা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আমি পালিয়ে এলাম।

রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম। এই দুঃস্বপ্নটা আগেও কয়েকবার দেখেছি। আজ আবার দেখলাম। স্বপ্নে একটা পাগল আমাকে তাড়া করছে। পাগলের হাতে চকচকে একটা ক্ষুর। সে মৃদু স্বরে বলছে — "ভয়ের কিছু নাই। ব্যথা দিমু না। ক্ষুর খুব ধার।" সে পেছনে পেছনে ছুটছে তার মুখ দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি পাগলটার মুখ দেখতে পাচ্ছি। খুব চেনা মুখ অথচ চিনতে পারছি না। পাগলটার মুখে শিশুসুলভ সারল্য, চোখ দুটি মায়া মায়া, গলার স্বরও অতি মধুর। সে খানিকক্ষণ পর পরই বলছে, "ভয়ের কিছু নাই। ক্ষুর খুব ধার। পোচ কইরা বসামু, টেরও পাইবেন না।"

জেগে উঠে দেখি, ঘামে সারা শরীর ভেজা। হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করছে। যেন সত্যি সত্যি এতক্ষণ ছুটছিলাম। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার ঘরে পানি থাকে না। একতলায় যেতে হবে পানির খোঁজে, অথচ যেতে ইচ্ছে করছে না, ভয়-ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে, দরজা খুললেই পাগলটার দেখা পাব। স্বপ্নের ঘোর কাটার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ঘোর পুরোপুরি কাটল না।

এ রকম একটা স্বপ্ন বার বার দেখার মানে কি ভাবতে ভাবতে দরজা খুলতেই দেখি — ছোটচাচা। আমার চিলকোঠার ঘর। দরজা খুললেই পুরো ছাদটা চোখে পড়ে। ছোটচাচা সিগারেট হাতে ছাদে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, দুঃস্বপ্ন দেখেছিস নাকি?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম — হ্যাঁ, বুঝলেন কি করে?

'গোঁ গোঁ শব্দ করছিলি।'

'খুব খারাপ স্বপ্ন। একটা পাগল ক্ষুর হাতে আমাকে তাড়া করছিল। পাগলাটাকে চিনি, আবার চিনি না।'

ছোটচাচা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, রাতে কি খেয়েছিলি? গুরুপাক কিছু খেয়েছিস, বদহজম হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ দুঃস্বপ্নের কারণ হচ্ছে বদহজম।

'তাই নাকি? আমি তো শুনেছি সাব-কনসাস মাইন্ড . . .'

'দূর! দূর! স্বপ্নের মূল কারণ হচ্ছে স্টমাক। পেটরোগা মানুষ সব সময় দুঃস্বপ্ন দেখে।'

'বাজে ক'টা ছোটচাচা?'

'ঘড়ি নেই। দু'টা থেকে আড়াইটা হবে। আমি একটার সময় ছাদে এসেছি।'

'ইনসমনিয়া?'

'হুঁ। আচ্ছা টুকু, ঐ মেয়েটার ব্যাপারে কিছু ভাবছিস? লোরেটার কথা বলছি।'

'না।'

'ভাবা দরকার তো। আমার মনে হয় সমিতার কোন আত্মীয়-বাড়িতে রেখে আসা দরকার।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা নয়। কাজটা জরুরি।'

'জরুরি হলে তো করতেই হবে।'

'বাচ্চাটা তোর ছোটচাচীর মনে চাপ ফেলেছে। ও এখন বেবী এক্সপেক্ট করছে। এই সময় মনে চাপ পড়লে বেবীর গ্রোথ ভাল হয় না। বুঝতে পারছিস কি বলছি?'

'পারছি।'

'হুট করে একটা বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে . . . '

'এখন তো ঝামেলা শেষ। আনন্দের শুরু।'

'ঠাট্টা করছিস না-কি?'

'না। ঠাট্টা করছি না। ঠাট্টা করব কেন? ছাদে বেশিক্ষণ একা থাকা ঠিক না। ভূতের উপদ্রব।'

'ভূতের উপদ্রব মানে।'

'কমলা প্রায়ই ভূত দেখে।'

'তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস না-কি? রাস্কেল।'

আমি সহজ মুখে নিচে নেমে এলাম।

৭

আজ জাজ সাহেব দু'টো গোলাপের জায়গায় এক তোড়া গোলাপ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। শুটকো লোকটা সাইকেলে করে গোলাপ নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে তিনিও একই সঙ্গে রিকশা করে উপস্থিত হয়েছেন। গোলাপগুলি তিনি নিজেও আনতে পারতেন, তা আনেন নি।

বসার ঘরে ঢোকার মুখে আমার সঙ্গে দেখা। তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন, এগারোটা গোলাপ এনেছে এগারো ভ্যারাইটির।

আমি শুকনো গলায় বললাম, ও।

'তুমি বোধহয় গোলাপ পছন্দ কর না?'

'জ্বি–না। কোন কাজে আসে না, তাই পছন্দ করি না।'

'কাজে আসে না বলতে কি মীন করছ?'

'কুমড়ো ফুলের কথাই ধরুন। দেখতে সুন্দর। একে বড়া বানিয়েও খাওয়া যায়। গোলাপের নিশ্চয়ই বড়া হয় না। না–কি হয়?'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ?'

'জ্বি–না। ঠাট্টা করব কেন? আপনি বসুন, আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।'

আমি বসার ঘরে ভদ্রলোককে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না। ব্যাটা থাকুক খানিকক্ষণ একা বসে। এক সময় বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে চলে যাবে।

জাজ সাহেবকে বসিয়ে রেখে আমি বেশ সময় নিয়ে চা খেলাম। মীরার সঙ্গে ঝগড়া করলাম। মীরার এখন ঝগড়া–রোগ হয়েছে। সবার সঙ্গেই ঝগড়া করছে। প্রেমে পড়লে মেয়েরা কি ঝগড়াটে স্বভাবের হয়? মীরার এবারের প্রেম বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে। ঐ ছোকরা বাড়ির সামনের রাস্তাতেই আস্তানা গেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সিগারেট হাতে সব সময় আছে। আমি খানিকটা খোঁজ–খবর নিয়েছি। জানলাম, সে রেডিও মেকানিক। এই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই আপত্তি। আমি শুধু বলেছিলাম — তোর ঐ খাতিরের মানুষটা রেডিও মেকানিক।

মীরা চোখ সরু করে বলল, তাতে অসুবিধা কি?

'বখাটে ছেলেরা যারা কাজ–টাজ জুটাতে পারে না তারা শেষ বয়সে রেডিও মেকানিক হয়। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে থাকে।'

'স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে থাকলে তোর কি অসুবিধা?'

'আমার কোনই অসুবিধা নেই। তোর অসুবিধা। যখন তখন তোর মাথায় স্ক্রু টাইট দিয়ে দেবে।'

'দিক'।

'আমার তো মনে হয় এখনি অনেকখানি টাইট দিয়ে দিয়েছে। আরো বেশি টাইট দিলে প্যাঁচ কেটে যাবার সম্ভাবনা।'

'আমাকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। দয়া করে নিজেকে নিয়ে ভাব।'

'আচ্ছা। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলে টাকাপয়সা নিয়ে পালাবি। তোর মেকানিক ব্যাটার হাতে একটা পয়সা নেই বলে আমার ধারণা। ঐদিন দেখলাম বাকিতে সিগারেট কেনার চেষ্টা করছে, দোকানদার দিচ্ছে না।'

'প্লীজ, তুই দয়া করে আমার সামনে থেকে যা।'

আমি বসার ঘরে চলে এসে অবাক হওয়া গলায় জাজ সাহেবকে বললাম — আরে আপনি! কখন এসেছেন?

ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তোমার সামনেই তো ঢুকলাম।

'সরি, লক্ষ্য করিনি।'

'লক্ষ্য করিনি মানে?'

'বাসায় অনেক রকম ঝামেলা — মাথা ইয়ে হয়ে আছে . . . '

জাজ সাহেবের রাগ সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল। রাগের জায়গায় চলে এল কৌতূহল। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ঐ নার্স মেয়ে কোন সমস্যা করছে না-কি? কেইস করে দেয়নি তো?

'জ্বি-না। অন্য সমস্যা।'

জাজ সাহেবের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে গেল। তিনি হৃষ্ট গলায় বললেন — আর কেইস যদি করেও মজা বুঝিয়ে দেব। বার হাত কাকুড়ের পনেরো হাত বিচি দেখিয়ে দেব।

'কেইস-ফেইস করবে না। ভদ্রমহিলার কোন ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। কেইস করবে কি? খুবই চিন্তার মধ্যে আছি।'

'চিন্তার কি আছে? ট্রেস না পাওয়া গেলে তো ভাল কথা।'

'উনার মেয়েটা এখানে আছে — এই এক সমস্যা'

'মেয়েটাকে এখনো নিয়ে যায়নি? বল কি! নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। তুমি এক কাজ কর — মেয়েটাকে ওর কোন আত্মীয়-বাড়িতে ফেলে দিয়ে আস। দেরি করবে না। দেরি করলে পরে পস্তাতে হবে।'

'দেখি।'

'না — দেখাদেখি না। যা করার এক্ষুণি কর। আমি এখন উঠি, দেখি বিকেলে খোঁজ নেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে টুকু।'

'চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন।'

'এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে লাভ হয় না। ভরসা রাখতে হয় বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর।'

'তাও ঠিক। আপনি তাহলে চলে যান, আমি দেখি কি করা যায়।'

জাজ সাহেব চলে গেলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, রাগে আমার শরীর কাঁপ্‌ছে।

আজ সকাল থেকেই কেন জানি রাগ লাগছে। কোনই কারণ নেই, তবু রাগ লাগছে। বাসার পরিস্থিতি ভাল। আনন্দময়। গত পরশু ছোটচাচা সবাইকে মহিলা সমিতিতে নাটক দেখিয়ে আনলেন। নাটক দেখে ফেরার পথে ঘোষণা করেছেন, আরেকটি গাড়ি কিনবেন। একটা গাড়িতে অসুবিধা হচ্ছে, দু'টা হলে ভাল। একটা থাকবে ফ্যামিলির প্রয়োজনে, অন্যটি নিজের।

বড়চাচার মনও খুব উৎফুল্ল। তিনি আরেকজন সাধুর খোঁজ পেয়েছেন। যিনি দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টাই গাছে উঠে বসে থাকেন। গেছো ব্যাঙ-এর মতো গেছো সাধু। এই সাধু না-কি গত পাঁচ বছর ধরে মৌনব্রত পালন করছেন। দিন সাতেক হল মৌনব্রতের কাল শেষ হয়েছে। এখন এর-তার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলছেন। ভ্রূ সব কথার বেশির ভাগই বোঝা যায় না।

আমি সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলাম, গাছে থাকতে থাকতে বাঁদর হয়ে যায়নি তো? বাঁদরের ভাষায় কথা বলছে বলেই হয়ত সাধারণ পাবলিক বুঝতে পারছে না।

আমার কথায় সবাই হাসল। এমন কি বড়চাচাও হাসলেন, শুধু বড়চাচী হাসলেন না। তাঁর মনটা এখন খুব অস্থির। অস্থিরতার কারণ হচ্ছে — তিনি আমেরিকা চলে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা কেউ কোন উৎসাহ দেখাচ্ছি না, কারণ বড়চাচার শরীর ভাল না। এদিকে চাচীর কোন লক্ষ্য নেই। তাঁর কথাবার্তায় বার বার আমেরিকা প্রসঙ্গ চলে আসছে। মেয়েদের কথা টেনে নিয়ে এসে বলছেন, না জানি ওরা কি কষ্ট করছে! এক হাতে সব করতে হয়। বাচ্চা দুটি হয়েছে মহাদুষ্টু। ছোটটা একবার ওভেনের দরজা খুলে চুপচাপ ভেতরে বসেছিল। কেউ সুইচ টিপে দিলে কি অবস্থা হত ভেবে দেখ। ওদেরকে একা সামলানো কি সহজ কথা! ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে যায়।

আমরা বুঝতে পারি এসব হচ্ছে বড়চাচীর প্রস্তাবনা। তিনি চাচ্ছেন, আমরা বলি — আপনি চলে যান।

আমরা ভুলেও তা বলছি না। বড়চাচার শরীর খানিকটা খারাপ হলে হয়ত বলতাম, কিন্তু তাঁর শরীর অনেকখানিই খারাপ। গাছে চড়া সাধুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সারাক্ষণ ঝিম ধরে আছেন। সারাক্ষণ বসে থাকেন। শুতে পারেন না। বিছানায় গেলেই নাকি পেটে গ্যাস হয়। এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে চলে যাবার কথা তিনি ভাবেন কি করে কে জানে।

এর মধ্যে মেজো মেয়ের চিঠি পেয়ে চাচী আরো অস্থির হলেন। ওদের না-কি খুব সমস্যা হচ্ছে। ছোটি বাচ্চাটি সিঁড়ি থেকে পড়ে পা মচকে ফেলেছে। বড়চাচী আমাদের সবাইকে কয়েক বার করে বলে ফেললেন —

'আরেকটু হলে হাত-পা ভাঙতো। মাথায় চোটি পেত। কে জানে হয়ত পেয়েছে, আমাকে জানাচ্ছে না। আসবার আগে এত করে বলে এলাম সিঁড়িগুলোতে বেড়া লাগিয়ে দিতে, নিশ্চয়ই লাগায়নি। আমেরিকাতে সিঁড়ি আটকানোর জন্যে প্রটেকটিভ ব্যবস্থা আছে। বিশ-ত্রিশ ডলারে পাওয়া যায়। বাচ্চারা তখন আর সিঁড়ি ডিঙাতে পারে না। ঐ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেনি। আর করবেই-বা কিভাবে? সে একা মানুষ, ক'দিক সামলাবে?'

আমার মা বড়চাচীকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে মাসখানিক অন্তত থাকেন। একজন অসুস্থ মানুষকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যে অন্যায় এটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। বড়চাচী বললেন, আমি কি বুঝি না? তুমি কি ভাব চলে যাবার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগছে? কিন্তু উপায় কি?

'উপায় আছে। ওরা ওদের ব্যবস্থা করবে।'

'কি করে করবে? দেশে একজন বিপদে পড়লে দশজন এগিয়ে আসে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব — ওখানে এইসব কোথায়?'

জুন মাসের শেষের দিকের এক বৃহস্পতিবারে বড়চাচীর টিকিট কনফার্ম করা হল। সেই দিনই রাত দশটায় আমি তাঁকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেলাম। বাসার সামনে একটা বেবিটেক্সী নিয়ে আসা হল।

বড়চাচী বেবিটেক্সী দেখে শুকনো গলায় বললেন, বেবিটেক্সী কেন? গাড়ি কোথায়? গাড়ি কোথায় আমরা কেউই জানি না। ছোটচাচা গাড়ি নিয়ে সেই সকালে বের হয়েছেন, এখনও ফেরেন নি। যদিও তিনি ভাল করেই জানেন আজ বড়চাচীর চলে যাবার দিন।

বড়চাচী বললেন, এয়ারপোর্টে কে কে যাচ্ছে? একটা বেবিটেক্সীতে হবে?

আমি বললাম হবে। আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না।

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, যাচ্ছে না কেন?

'যাবার দরকার কি? এত রাতে খামাকা কষ্ট। গাড়ি থাকলেও একটা কথা ছিল। দেরি করে লাভ নেই, উঠে পড়ুন।'

যথারীতি অত্যন্ত করুণ একটা বিদায়-দৃশ্যের অভিনয় হল। তিনি বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। জড়ানো গলায় বললেন — ওদের কাছে দু'-তিন সপ্তাহ থেকে চলে আসবো, আর যাবো না। ভালো লাগে না। বাকি জীবনটা দেশেই কাটাব। উনারও শরীর খারাপ হয়েছে, সেবা-যত্ন দরকার।

বড়চাচীর এধরনের কথার কোনই গুরুত্ব নেই। প্রতিবারেই যাবার সময় এসব বলেন।

এয়ারপোর্টে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসালেন। এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হল যে, চারদিকে লোক জমে গেল।

'ও টুকু রে, যত ঝামেলা শুধু তোর উপর দিয়ে যায়। তোর জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় রে টুকু! দেখি তোর জন্যে কিছু করা যায় কি-না। জামাইকে বললে সে একটা ব্যবস্থা করবে। অনেক কংগ্রেসম্যানকে সে চিনে। ওদের কাছে ইমিগ্রেশনের কথা বললেই করে দেবে। তুই একটা বায়োডাটা পাঠিয়ে দিস।'

বাসায় ফিরতে রাত দুটো বাজল। এসে শুনলাম, বড়চাচার অবস্থা খুবই খারাপ। লক্ষণ দেখে মনে হয়, মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। খুব ঘাম হচ্ছে। পানির পিপাসা হচ্ছে। হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। হাসপাতালে নেবার কথা উঠতে আতঙ্কে অস্থির হচ্ছেন।

অস্পষ্ট গলায় বলছেন — না, না, না।

পাড়ার ডাক্তার বললেন, হাসপাতালের কথায় ইমোশনালি আপসেট হয়ে যাচ্ছে। এতে আরো খারাপ হবে। আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা একজন হাইস্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমার বাবা খুবই ভীতু ধরনের মানুষ। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, বাঁচবে তো ডাক্তার সাহেব?

'হ্যাঁ, বাঁচবেন। আমার তো মনে হয় ভালো ঘুম হলে দেখা যাবে শরীর ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। হার্টের কোন অসুখ বলে আমার মনে হচ্ছে না, যদিও সিম্পটমস্ সব এক। আমার মনে হচ্ছে, অসুখটা মানসিক। ভালমত বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।'

অভিজ্ঞ ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে খুব অনভিজ্ঞের মত করেন। বড়চাচার ওটা ছিল বড় ধরনের একটা এ্যাটাক। তাঁকে সময়মত হাসপাতালে না নেওয়ার কারণেই হয়ত শরীরের ডান দিকটা অচল হয়ে গেল। প্যারালিসিস। ডাক্তাররা খুব সান্ত্বনা দিলেন। ওটা কিছুই না। কমপ্লিট বেডরেস্ট। তারপর কিছু লাইট এক্সারসাইজ। এর বেশি কিছু লাগবে না। নাথিং।

সপ্তাহখানিকেরও বেশি রেস্ট নেয়া হল, লাইট এক্সারসাইজ করা হল, লাভ কিছু হল না। অবশ হয়ে-যাওয়া অঙ্গে কোন সাড়া ফিরে এল না। শুধু সন্ন্যাসী ভোলাবাবু ঘোষণা করলেন — কর্দমস্নান দিলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। নয়টা চলমান জলধারায় নির্মিত ঘাটের কাদার সঙ্গে নয় বদ্ধ জলাধারের ঘাটের কাদা মিশিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কলাগাছের ভেতরের শাঁস। অশোক গাছের পাতার রস এবং অর্জুন গাছের ছাল সিদ্ধ পানিও মেশাতে হবে। ঐ জিনিস রোগির সারা গায়ে মাখিয়ে রোগিকে সারাদিন রোদে শুইয়ে রাখতে হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এতেই কাজ হবে!

'অবশ্যই হবে। দ্রব্যগুণ আছে। ওতেই হবে।'

'কোন মন্ত্রফন্ত্র নেই?'

'আছে। মন্ত্রও আছে। আপনারা মুসলমান মানুষ। আপনারা তো আর মন্ত্র পড়বেন না। আপনাদের জন্য শুধু দ্রব্যগুণ।'

'ঠিক আছে। আপনি আপনার কর্দমস্নানের ব্যবস্থা করুন। হলে তো ভালই। টাকাপয়সা কেমন খরচ হবে?'

'টাকাপয়সা খরচের জায়গা কোথায়? আমাকে গাঁজা কেনার কিছু দিলেই হবে। আর কিছু লাগবে না — ও, আর মাটির একটি গামলা।'

ভোলাবাবু কর্দমস্নানের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। আমরা সবাই মোটামুটি খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। যেদিন কর্দমস্নান হবে তার আগের দিন বড়চাচার ছোট মেয়ের চিঠি এসে উপস্থিত। দীর্ঘ চিঠি। পুরো চিঠি ইংরেজিতে লেখা। বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম হবে —

বাবা,

আমার আদর ও ভালোবাসা নাও। গত পরশু মা এসে পৌঁছেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তোমার শরীর ভাল না। তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে মা চলে আসবেন, কল্পনাও করিনি। তোমরাই-বা কি মনে করে তাঁকে ছাড়লে?

আমার এখানে এসে তিনি নানান রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেন। যেমন সবার সব ব্যাপারে নাকগলানো। যেখানে তাঁর কথা বলার কিছু নেই, সেখানেও তিনি কথা বলবেন। যা শোনার না তাও তিনি শুনবেন। আমি আমার বরের সঙ্গে কি কথা বলছি, তা শোনার জন্যে আড়ি পাতবেন।

আমি জানি এসব তিনি করেছেন আমার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এতে তেমন কোন মঙ্গল হচ্ছে না। বরং অমঙ্গল হচ্ছে। তোমাদের জামাই পুরো ব্যাপারটায় খুবই সঙ্গত কারণেই বিরক্ত হচ্ছে। তোমাকে আমি জানাতে চাই নি। তবু বাধ্য হয়ে জানাচ্ছি — মা গত বৎসর হিউম্যান রাইটস এবং এদেশের নারী সংঘের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন যে, আমার স্বামী আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। কি ভয়াবহ কথা চিন্তা করে দেখ! সেখান থেকে তদন্তের জন্যে লোক এসে উপস্থিত।

তোমাদের জামাই লজ্জায় এবং দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। সব পরিবারেই ঝগড়া হয়। ও যেমন চিৎকার করে, আমিও করি। এর মানে নারী নির্যাতন নয়। আমরা সুখেই আছি। ছোটখাট সমস্যা আমাদের অবশ্য আছে। তবে তা আমরা নিজেরাই দূর করব। মা'র হস্তক্ষেপ ছাড়াই করব।

মা'কে আমরা দেশে ফেরত পাঠাতে চাই। তোমার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের জন্যেও তাঁর থাকা দরকার। আমরা খুব চেষ্টা করছি দ্রুত মা'র

টিকিটের ব্যবস্থা করতে। বাবা, এই চিঠির বিষয়বস্তু মা না জানলে ভাল হয়। জানলে তিনি কষ্ট পাবেন।

বড় চাচার কর্দমস্নান শুরু হল।

বেশ উত্তেজক দৃশ্য। লোরেটা পর্যন্ত স্কুলে যায়নি। আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বড়চাচাকে একটি চটাইয়ে শুয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে মাটির গামলা ভর্তি কাদা। ভোলাবাবু ডাল মোটার ঘুটনিতে প্রবল বেগে কাদা ঘুঁটছেন। কাদা মন্থন করে মাখনের মতো কিছু তুলতে চান কিনা কে জানে।

মীরা বলল, সন্ন্যাসী চাচা, এরকম করছেন কেন?

ভোলাবাবু মধুর স্বরে বললেন, কাদা মিহি বানাচ্ছি মা জননী। তাই নিয়ম।

ভোলাবাবু আমাকে ভাই ডাকলেও মীরাকে মা ডাকেন। আমার মা'কেও মা ডাকেন। বেলা ন'টার দিকে ভোলাবাবু বললেন, এইবার কর্দমস্নান শুরু হবে। ন'টা পাঁচ মিনিটে লগ্ন শুভ। যদি কেউ ছবি তুলতে চান ছবি তুলেন।

ঘরে ফিল্ম ছিল না। একজন দৌড়ে গিয়ে ফিল্ম আনল। সেই ফিল্মে ছবি তোলা হল।

কর্দমস্নানের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। স্নান শেষ হবার পর গোসল দেয়া হল। গোসলের পর দেখা গেল বড়চাচার শরীরের বা অংশটাও এখন অচল। পুরো প্যারালিসিস।

ভোলাবাবু শীতল গলায় বললেন, সবই ভগবানের লীলা! আমাকে গরম এক কাপ চা দিতে বলুন তো। কাঁদা ঘেঁটে ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

৮

সকাল দশটায় মজার একটা খবর পাওয়া গেল। খবরটা হল — রিমির মা ফরিদা খালা বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের নাম সেলিম। বিয়েটা কয়েকদিন আগেই হয়েছে। খবর পাওয়া গেল আজ। বাইরের কারো মুখ থেকে খবর পাওয়া গেলে আমরা চট করে বিশ্বাস করতাম না। খবর দিলেন খালা নিজেই। টেলিফোন করে মা'কে বললেন, বড় আপা, আপনাকে একটা খবর দিতে চাই। খবর দিতে লজ্জা লাগছে। কে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করে কে জানে। আমাদের নেচারই হচ্ছে নেগেটিভ সাইডটা আগে দেখা।

মা বললেন, খবরটা কি?

'এই সমাজে মেয়েদের একা থাকা যে কি যন্ত্রণা, তা তো সবাই জানে। মেয়েদের একা থাকা অসম্ভব ব্যাপার। একজন অভিভাবক লাগেই। তাছাড়া আপা, আপনি তো জানেন না রিমির বাবার দিকের আত্মীয়রা আমাকে কি রকম বিষদৃষ্টিতে দেখে।

সারাক্ষণ চেষ্টা — কি করে আমাকে ঠকাবে। ঐদিন রিমির মেজচাচা আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার চাইল। আমি বললাম — এত টাকা আমি পাব কোথায়? এতে রেগেমেগে যেসব কথা বলল আপনি শুনলে হার্টফেল করবেন। . . .'

'খবরটা কি সেটা আগে বল।'

'আপনি কিছু শুনেননি?'

'না।'

'আমি বিয়ে করেছি বড় আপা। মাথার উপর যেন একজন অভিভাবক থাকে এই জন্যে করা। রিমিও মত দিয়েছে।'

'রিমিও মত দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আসলে ও আমাকে ইনসিস্টও করেছে।'

ফরিদা খালা দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। মা'র স্মৃতিশক্তি তেমন ভাল না। বেশির ভাগ কথাই তিনি ভুলে যান কিন্তু টেলিফোনের কথোপকথনের পুরোটা তিনি গড় গড় করে আমাদের বললেন। দাড়ি-কমাও বাদ দিলেন না। বাড়ির মেয়েদের খুব দুঃখিত মনে হলেও তেমন দুঃখিত হয়ত তারা হল না। তাদের চোখে-মুখে চাপা উল্লাস। বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করে এই খবর ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা। দেখা গেল বাসায় প্রায় সবাই জানতো যে এরকম একটা-কিছু হবেই। ভবিষ্যতে কি হবে, সেটাও দেখা গেল সবাই জানে।

মীরার ধারণা, সেলিম নামের এই লোক ভুজুংভাজুং দিয়ে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নেবে। টাকাপয়সা হাত করবে। তারপর লাথি দিয়ে স্ত্রীকে খেদিয়ে দেবে।

ইরা অবশ্যি মীরার সঙ্গে একমত হল না। ইরার ধারণা, ফরিদা খালা ঐ লোকটার টাকাপয়সা সব হাত করবে, তারপর লোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করবে।

ফরিদা খালার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কি হবে না, এই নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হল। দুই রকম অভিমত পাওয়া গেল। একদল বলছে সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না। অন্যদল বলছে, রিমির কারণেই সম্পর্ক রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে রিমিকে ঐ বাড়ি থেকে এনে এ বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই জাতীয় ক্রাইসিসে আমার সব সময় একটা ভূমিকা থাকে। বেশির ভাগ সময় আমাকে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবারেও তাই হল। মা আমাকে ডেকে বললেন, তুই সন্ধ্যাবেলায় ঐ বাড়িতে যা। ব্যাপারটা কি ভাল করে জেনে আয়।

'রিমির সঙ্গেও কথা বলবি। ওর মনোভাব জানবি।'

আমি আঁতকে উঠলাম। ঐ রাতের পর রিমিদের বাড়িতে যাবার প্রশ্নই উঠে না। খালা জুতাপেটা না করলেও যা করবেন তাও কম না। আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, মেয়েরা কেউ গেলেই তো এসব ভাল জানতে পারবে।

'আরে না। মেয়েরা গেলেই সন্দেহ করবে। কিছু বলতে চাইবে না। তোর বোকা-বোকা চেহারা, তোকে কেউ সন্দেহ করে না। তুই সন্ধ্যার পর যা।'

আমি আমার বোকা-বোকা চেহারা নিয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম। খালা বেশ সহজ স্বাভাবিক। আমাকে দেখে হাসিমুখেই তাকালেন। রিমিও বেশ স্বাভাবিক। সুন্দর শাড়ি পরে ঘুর ঘুর করছে। আমাকে বলল, বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ কেমন দেখছিস? কাছে গেলেই সেন্টের গন্ধ পাবি। ভুড় ভুড় করে সেন্টের গন্ধ বের হয়। সেলিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। আগেও এ বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি, কখনো কথা হয়নি। আজ তিনি প্রচুর কথা বললেন। তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতা কি করে দখল করা হয়, এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। একাত্তরে ত্রিশ লাখ লোক মারা গেছে বলে চারদিকে যে প্রচার, এটার ভিত্তি কি সে সম্পর্কেও অনেক কথা বললেন। কথার ধরন-ধারণ থেকে মনে হয়, বিরাট চালবাজ লোক। তবে ভদ্রলোকের চেহারা ভাল। স্মার্ট লোক। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কই ফরিদা, বেচারাকে কিছু খেতে-টেতে দাও। আমি বক্তৃতা দিয়ে তো বেচারার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি।

খালা চা-বিসকিট নিয়ে এলেন এবং অসম্ভব আদুরে গলায় বললেন, এই নিয়ে তোমার আট কাপ চা খাওয়া হল। আর কিন্তু চা হবে না।

'ডোন্ট বি টু হার্ড অন মি।'

'অসম্ভব, আর তোমাকে চা দেব না। শেষে রাতে ঘুম হবে না। দেখ না টুকু, সারাদিন চুক্ চুক্ করে চা খায়, তারপর রাতে ঘুম হয় না। জেগে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাকেও জেগে থাকতে হয়। এই বয়সে কি আর রাতজাগা পোষায়, তুই বল?'

এই রকম আদুরে মিষ্টি গলায় খালা কি তার আগের স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছেন? হয়ত বলেছেন। বলাই স্বাভাবিক। তবে আমি শুনিনি। আমি সব সময় তাদের ঝগড়া করতেই দেখেছি। তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে কুৎসিত ঝগড়া। একবার আমার সামনেই ফরিদা খালা চেঁচিয়ে বললেন — তোমার সঙ্গে বাস করা আর রাস্তার এক কুকুরের সঙ্গে বাস করার মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

খালু সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমাকে তুমি কুকুর বলছ? ফরিদা খালা শীতল গলায় বললেন, হ্যাঁ বলছি। এক'শ বার বলছি। এখন তুমি আমাকে কি করবে? মারবে? মার। মারটা বাকি থাকে কেন? বউ মেরে হাতের সুখ কর। হাতের সুখ বাকি থাকে কেন?'

সেই খালা আর এই খালায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজ তিনি কি সুন্দর করে কথা বলছেন। চেহারাটাও ভাল লাগছে। চোখে-মুখে আনন্দ ও সুখের ছাপ। খালাকে দেখতে ভাল লাগছে। বিয়ে করে তিনি কোন অন্যায় করেছেন বলে আমার মনে হল ন। মনে হচ্ছে, তিনি ঠিকই করেছেন। খালা বললেন, তুই খেয়ে যা। না খেয়ে যাবি না। পাবদা মাছ মটরশুটি দিয়ে রান্না করেছি। সেলিম সাহেব বললেন, সব রান্নায় তুমি

খানিকটা মটরশুটি দিয়ে দাও কেন বল তো?

'তুমি না বললে মটরশুটি তোমার ভাল লাগে।'

'একবার বলেছিলাম, তারপর থেকে সবকিছুতেই মটরশুটি।'

'আচ্ছা বাবা যাও, আর দেব না।'

আমার সামনেই তাঁরা রাগ এবং অভিমান দেখাতে লাগলেন। আমার দেখতে ভালই লাগল। রাতে তাঁদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলাম। রিমি একের পর এক মজার মজার গল্প করে আমাদের হাসাতে লাগল।

'একটা লোক গাড়ি করে যাচ্ছিল, এক্সিডেন্ট করল। ট্রাফিক পুলিশ জিজ্ঞেস করল — এক্সিডেন্ট হল কিভাবে? সে বলল, আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার। গাড়ি চালাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে রিকশা। রিকশাকে সাইড দিলাম। তারপর দেখি একটা টেম্পো। টেম্পোকে সাইড দিলাম। তারপর দেখি ঝড়ের বেগে ট্রাক আসছে। ট্রাককেও সাইড দিলাম। তারপর দেখি একটা ব্রীজ। ব্রীজটাকে সাইড দিতে গিয়েই এক্সিডেন্ট।'

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রিমির নতুন বাবা গড়িয়ে পড়লেন। একেকবার হাসি থামিয়ে তিনি বহু কষ্টে বলেন — সো ফানি। তারপর আবার হাসি।

খাওয়ার শেষে রিমি আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি বললাম, যাই রিমি?

'আচ্ছা যা। টুকু, একটা কথা শুনে যা।'

'বল।'

'আমার যদি কখনো চরম কোনো দুঃসময় আসে তুই কি আমার পাশে থাকবি?'

'থাকব।'

'তোর থাকা-না-থাকা অবশ্যি সমান। তুই তো মানুষ না। তুই হচ্ছিস মানুষের ছায়া। তবু থাকিস।'

'দুঃসময়টা কখন আসবে?'

'শিগ্‌গিরই আসবে। এক রাতে এই নব-দম্পতির ঘরের দরজার শিকলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেব। তারপর বলব — মা এবং বাবা নাম্বার টু, আমি এখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি। পেট্রোল ঢালা হয়েছে। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আগুন দেব। তোমরা বাঁচার চেষ্টা কর। তারপর খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাই করব। আচ্ছা টুকু, তুই এক গ্যালন পেট্রোল যোগাড় করে দিতে পারবি?'

আমি জবাব না দিয়ে চলে এলাম। রিমির পাগলামির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই আমি পরিচিত। তার পাগলামি চোখে পড়ার মত হলেও কখনো সীমা অতিক্রম করে না। আমি জানি, এইবারও করবে না। — তবু বুকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। কেন করছি জানি না।

বাসায় ফেরামাত্র ছোটচাচা বললেন, লোরেটার এক দূর-সম্পর্কের খালার সন্ধান পাওয়া গেছে। উনি এসেছিলেন। মেয়েটাকে নিতে রাজি হয়েছেন। তুই কাল ভোরে তাকে দিয়ে আসবি।

আমি যথারীতি বললাম, আচ্ছা।

৯

লোরেটা ও আমি রিকশা করে যাচ্ছি। আমি বললাম, তোমার কি মন খারাপ?

'না।'

'আমার তো খুব মন খারাপ লাগছে। তোমার কেন লাগছে না লোরেটা?'

'তোমার কি কান্না পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কই দেখি?'

আমি তাকালাম লোরেটার দিকে। লোরেটা দেখল আমার চোখ জলে ভেজা। সে মমতাময়ী নারীর গলায় বলল, আমি যখন বড় হব তখন তোমাকে বিয়ে করব।

আমি বললাম, আচ্ছা। আমি কি মাঝে মাঝে তোমার খোঁজ নিতে আসব?

'না'

'যোগাযোগ তো থাকা দরকার। ধর, ঐ বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে গেলাম। তুমি তো জানবে না কোথায় গেছি।'

'বড় হয়ে আমি তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করব।'

'ঠিক আছে।'

লোরেটাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি, সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। গায়ে কোনই কাপড় নেই। আমাকে দেখেই, এই যে এই যে বলে এগিয়ে এলেন। আমি আঁৎকে উঠলাম। ভাবলাম নির্ঘাৎ কোন উন্মাদ।

'টুকু সাহেব, ভাল আছেন? আমি ভোলা।'

'ও আচ্ছা।'

'কাপড়-চোপড় ছেড়ে পুরো নাঙ্গা হয়ে গেলাম।'

'তাই তো দেখছি।'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, জ্বর-জ্বারি হচ্ছিল। একটু বৃষ্টিতেই জ্বর। নাঙ্গা হবার পর শরীরটা ঠিক হয়ে গেছে।

'লজ্জা লাগছে না?'

'প্রথম বার ঘণ্টা লজ্জা লাগে, তারপর আর লাগে না। চলুন এক কাপ চা খাই।'

'এই অবস্থায় রেস্টুরেন্টে বসে চা খাবেন?'

'জ্বি-না। মাঠে বসব। ছোট ছোট ছেলে আছে, তারা চা এনে দিবে। ভাইজান, টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

'জ্বি আছে।'

আমরা রেসকোর্সের মাঠে গিয়ে বসলাম। ভোলাবাবু বললেন, আচ্ছা, আপনার কি কখনো সাধু-সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে?

'না।'

'করলে সরাসরি নাঙ্গা হয়ে যাবেন। ঈশ্বরের ধ্যান-ট্যান কিছু করতে হবে না। শুধু মনটাকে হাল্কা করে ছড়িয়ে দেবেন। ওতে কাজ হবে।

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

'আমি কিন্তু সাধু হিসেবে অনেক উপরের দরের। আপনি বোধহয় বিশ্বাস করছেন না।'

'না।'

'আপনার সম্পর্কে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হচ্ছে — আপনার জীবনটা কষ্টে কষ্টে কাটবে।'

'চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ধন্যবাদ।'

'সতেরো বছর এই রকম কাটবে, তারপর আপনার বিবাহ হবে। যে কন্যাটির সঙ্গে বিবাহ হবে সে বয়সে আপনার চেয়ে খুব কম করে হলেও কুড়ি বছরের ছোট।'

আমি তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর দিকে তাকালাম।

ভোলাবাবু হাসি-হাসি মুখে তাকালেন। নরম গলায় বললেন, সতেরো বছর পর বুঝবেন — ভোলাবাবু নকল জিনিস না।

আমি কিছুই বললাম না।

ভোলাবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন —

খেপার মতন কেন এ জীবন,
অর্থ কি তার, কোথা এমন,
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।

এই কবিতাটা কার লেখা বলুন তো? বলতে পারলেন না। আমিও জানি না। একবার শুনছিলাম, মনে গেঁথে আছে। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র টুকু সাহেব! বড়ই বিচিত্র!